কী ক'রে লিখব

কী ক'রে লিখব

সঞ্জীব দেব লস্কর

সৃজন

সৃজন গ্রাফিকস্ অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস
শিলচর– ৭৮৮০০১

কী ক'রে লিখব

সঞ্জীব দেবলস্কর

KI KORE LIKHBO

Sanjib Deblaskar

গ্রন্থস্বত্ত্ব : পুষ্পিতা দেবলস্কর
© Puspita Deblaskar

প্রথম প্রকাশ : শিলচর বইমেলা, ডিসেম্বর ১৯৯৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : ২০১৮
প্রচ্ছদ : সৃজন

প্রকাশক : সৃজন গ্রাফিক্স অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর-১, কাছাড়
মুদ্রণে : শিলচর সানগ্রাফিক্স, প্রেমতলা, শিলচর-১

মূল্য : ২৫০ টাকা

উনিশে' মে-র উত্তরাধিকারীদের প্রতি

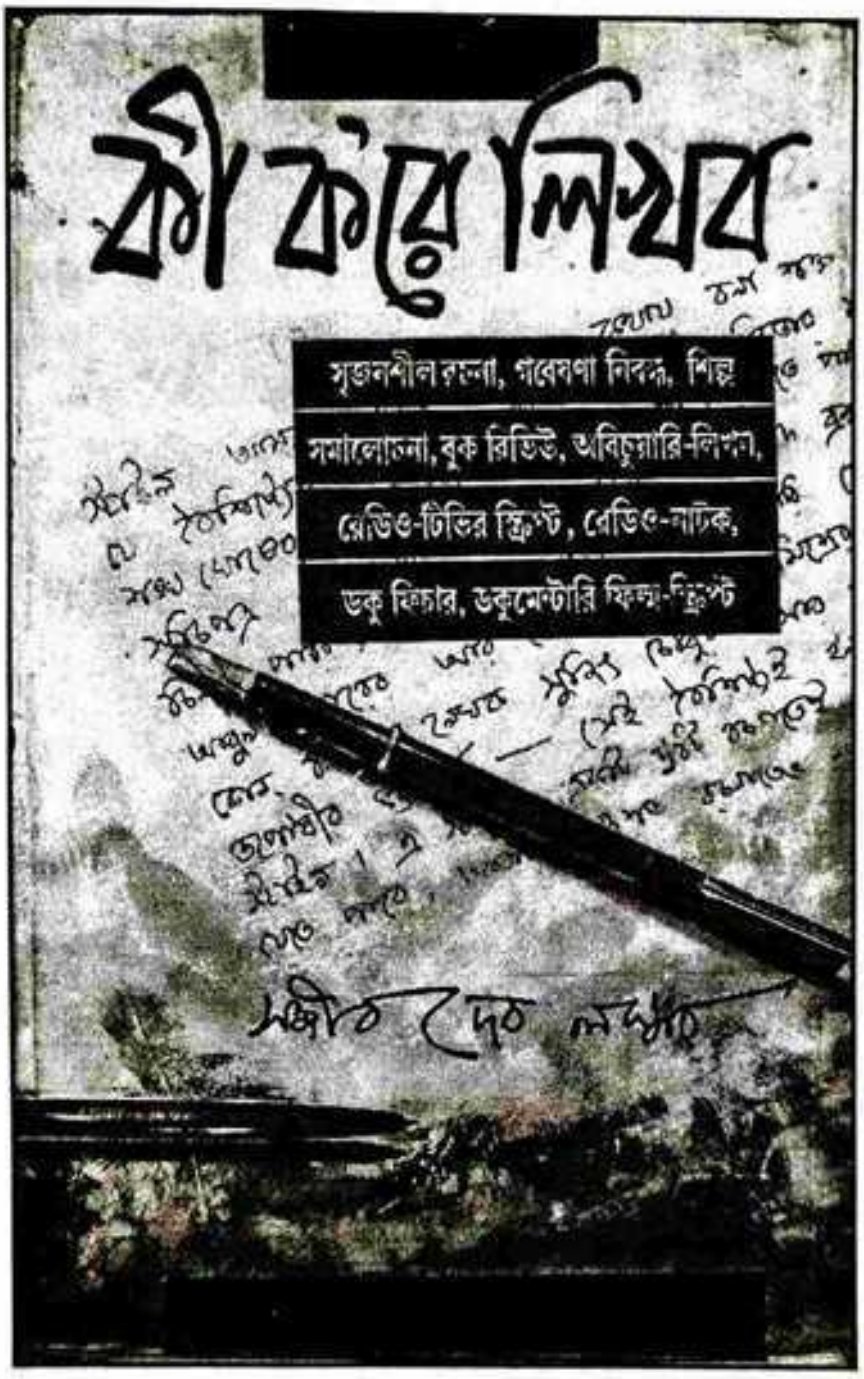

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

লেখালেখি ব্যাপারটা এমন যে তাকে চট করে ধুলোমাটি ঘাসের আওতায় আনতে দ্বিধা বোধ করি আমরা। লেখাকে মহিমান্বিত করার অভ্যাস সম্ভবত মনস্তাত্ত্বিক কারণেই দুর্নিবার। লেখার আগে এবং পরে লেখকসত্তা কেমন থাকে, দৈনন্দিন বাস্তব থেকে কতখানি 'উত্তরণ' ঘটে তাঁর– এসব ভাবতে আমরা ভালবাসি। অথচ যাঁরা লেখক তাঁরা সবাই লেখক নন, কেউ কেউ লেখক এই সত্যটি অস্বীকার করার উপায় নেই কারো। ঠিক কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে লেখাকে আলাদাভাবে চিনে নেওয়া যায়, এবিষয়ে নানা মুনির নানা মত। এই ঝামেলায় না গিয়ে লেখার অন্দরমহলে অর্থাৎ লেখা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার প্রতি যদি নজর দেওয়া যেত, খড়কুটোর কাঠামোর গুরুত্ব মনোলোভা প্রতিমার পক্ষে কত বেশি– তা বুঝে নিতাম সহজে। কিন্তু এই কাজটা তেমনভাবে করেননি কেউ।

এমন নয় যে এ-কাজ খুব শক্ত। তবু যে আনন্দ প্রকাশনীর নির্দেশাত্মক বই ছাড়া লেখার অন্দরমহলে পৌঁছানোর পথরেখা তৈরি করলেন না কেউ, এর মূল কারণ, ইপ্সিত দৃষ্টি প্রস্তুত না হওয়া। এই দৃষ্টি হবে একাধারে সস্মিত ও অনুরাগী, গম্ভীর ও পরিহাসপ্রবণ, সন্ধানী ও মুক্তিপ্রত্যাশী। এমন চোখ পাওয়া তো সহজ নয় যা তাকায় না কেবল, দেখেও। বলা ভালো, দেখে না শুধু, দেখাতেও জানে। এই দৃষ্টি যাঁর আছে, তিনি জানেন, এমন কিছু নেই পৃথিবীতে যার কোন ব্যাকরণ নেই। তাই লেখারও আছে নিজস্ব ব্যাকরণ। তবু তিনি ব্যাকরণের ভ্রুকুটিমাত্র লক্ষ করেন না, ব্যাকরণ পেরিয়ে যাওয়া আনন্দকেও শনাক্ত করেন।

আরো একটি কথা আছে যা সম্ভবত সবচেয়ে আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাঙালির ভাষা পৃথিবীর সমৃদ্ধ ভাষার মধ্যে একটি। এই সমৃদ্ধির বহু কারণ রয়েছে। এখানে একটি উল্লেখ করছি। ভারতীয় উপমহাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের মুখের ভাষা অনেকান্তিক। পশ্চিমবাংলায়, বাংলাদেশে, ত্রিপুরায়, আসামের বরাক উপত্যকায়, আসামের অন্যান্য অঞ্চলে, মেঘালয়ে, বিহারে এবং লন্ডনে কত রূপ তার, কত বৈচিত্র্য। মহকুমায়-মহকুমায়, থানায় থানায়, পরগণায় উপভাষা ও বিভাষার দুর্বার চলিষ্ণুতা ভাষাবাস্তবতার আশ্চর্য সংশ্লেষণাত্মক রূপ তুলে ধরছে। কথ্যভাষা নিছক দুয়োরাণী আর লেখ্যভাষা অবশ্যমান্য সুয়োরাণী– এমন ধারণা করি যদি, বাংলা লিখতে গেলে সমস্যা হতে বাধ্য।

আবার, যেখানে আমাদের শক্তি, সেখানেই আমাদের দুর্বলতা। অনিবার্য ঐতিহাসিক কারণে আলোর সহগামী প্রচ্ছায়া। বাঙালির ভুবনে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মপ্রতারণা সবচেয়ে বড়ো ব্যাধি সম্ভবত। তার ওপর, নয়া ঔপনিবেশিক এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বাঙালির লেখ্য ও কথ্য ভাষা আক্রান্ত। উত্তরপূর্ব ভারতের বঙ্গভাষী জনেরা বহুক্ষেত্রে আধা-ঔপনিবেশিক অন্তর্ঘাতের শিকার। হু হু করে লেখ্য ভাষায় ঢুকে যাচ্ছে বিদুষণের বেনো জল।

এইজন্য 'কী ক'রে লিখব' প্রশ্নটা নিছক সারস্বত প্রশ্ন থাকে না, সামাজিক প্রশ্নও হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রশ্ন থেকে জন্ম নেয় আরো অনেক প্রশ্ন। সমাধান খুঁজতে গিয়ে মনে রাখতে হয়, বাঙালির চেতনাবিশ্ব এক ও অবিভাজ্য; তবু তিন ভুবনে এই বোধ সমান দৃঢ়ভিত্তি পায়নি। কোথাও মৌলবাদ, কোথাও আঞ্চলিকতাবাদ, কোথাও আধা-উপনিবেশবাদ দৃষ্টিকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে। ওই প্রশ্নের উত্তর যিনি খুঁজবেন, তাঁকে মনে রাখতে হয় যুগপৎ অবিভাজ্য বাঙালিসত্তাকে এবং অবস্থানগত পার্থক্য প্রতীতিকেও।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারেন আলাদা আলাদাভাবে পশ্চিমবাংলা বা বরাক উপত্যকার অধিবাসী গদ্যশ্রমিকেরা। আমরা শুধু লক্ষ করব, তৃণমূল স্তরে পৌঁছাতে পারছেন কি না দৃষ্টান্ত আহরণের জন্যে। মনে রাখছেন কি না, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় ভুবনের বাঙালিরা আসলে পরস্পর সমান্তরাল হয়ে একই সামূহিক বাচনের মধুবর্ষণ করে চলেছেন।

তরুণ গবেষক সঞ্জীব দেবলস্কর আমাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পুরণ করেছেন তাঁর এই ব্যতিক্রমী বইতে। পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠক হিসেবে আমি নিশ্চিত, প্রতিটি অঞ্চলের বাঙালি লেখক (এবং যারা অচিরেই লেখক হওয়ার পথে পা' বাড়াচ্ছেন) এই বই থেকে লেখার আনন্দ ও চিন্তার পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারবেন।

২৫শে বৈশাখ, ১৪০৬
শিলচর, কাছাড়
আসাম।

তপোধীর ভট্টাচার্য

লেখকের কথা

এ বই লেখার দায়িত্ব কেউ আমার উপর চাপিয়ে দেয়নি– আমি স্বেচ্ছায় নিয়েছি। কাউকে লেখা শেখাব– এ দুঃসাহস আমার নেই। এ আসলে আমার নিজের সঙ্গে নিজেরই কথোপকথন। মূলতঃ এ আমার নিজেরই শিক্ষানবিশি।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় তপোধীর ভট্টাচার্যকে মাঝে মাঝে এটা ওটা জিজ্ঞেস করেছি, মতামত চেয়েছি ওঁর; পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনিয়েছি এ ব্যস্ত মানুষটিকে। বিরক্তি দেখিনি ওঁর চেহারায়। শুনে গেছেন বিস্তর, মতামত দেওয়াটা সুচতুর ভাবে এড়িয়ে গেছেন প্রশ্রয় সূচক হাসি হেসে হেসে, এবং ওঁর এ খেলাটিই শেষ পর্যন্ত বইটিকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে গেল। প্রকাশনার ব্যবস্থা, ভূমিকা লিখে দেওয়া– এসব অবশ্য ওঁর কাছে আমার অতিরিক্ত দাবি। এ জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাবার ধৃষ্টতা করব না।

লোকসংস্কৃতি গবেষক অমলেন্দু ভট্টাচার্য বন্ধুর ভূমিকায় থেকে আসলে শিক্ষকের কাজই করছেন অনেকদিন থেকে– এ বই লিখতে গিয়ে টের পেয়েছি। বরাক উপত্যকার আরও অনেক পাঠক, লেখক, গবেষক, সাংস্কৃতিক কর্মী আমাকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আমার সহকর্মীরা– বিশেষ করে মধুসূদন সিংহ, মজম্মিল আলি মজুমদার পুরো পাঁচটি মাস সরকারের খামখেয়ালীতে মাইনে বিহীন আমাকে কী জানি কী ভেবে দিব্যি খেয়ে প'রে লিখে যাবার সুবিধাটুকু করে দিয়েছেন। আমার গ্রামীণ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক চান্দু মিঞা লস্কর হাসি মুখে বইপত্র বের করে দিয়েছেন চাওয়া মাত্রই। সহকর্মী জয়ন্ত দেবরায় ও সুমিতা ঘোষ পাণ্ডুলিপি মন দিয়ে পাঠ করেছেন। অধ্যক্ষ সহ অপরাপর সহকর্মীদের সহযোগিতা এবং উৎসাহ আমার পরম প্রাপ্তি।

এ বইতে বিভিন্ন লেখকের সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সূত্রের উল্লেখ সহ। বাংলা ভাষার বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলের যে সকল লেখক কিংবা গল্পকারের রচনার প্রসঙ্গ এসেছে এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিতও। যাঁদের রচনার অংশ বিশেষ কিংবা পংক্তি বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে এদের

প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। সংসার সামলানো এবং শব্দ সন্ধানে আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী পুষ্পিতা দেব লস্করের একটি ভূমিকা রয়েছে। আমার শিশুপুত্র শ্রীমান শাশ্বতও আমাকে অবিরত বই পত্র, কাগজ কলম এবং অভিধান এগিয়ে দিয়েছে উৎসাহের সঙ্গে।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এ বইটি প্রকাশনায় এগিয়ে এসেছেন। প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন শ্রী অ্যালবার্ট বি. অশোক।

'মহাজাতি প্রকাশনা'র মুদ্রণ কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে বইটি ছাপিয়েছেন। এদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত বইটি অনেক দিন আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত এ বইটির সামান্য ক'টি সংখ্যাই বরাক উপত্যকা তথা আসামে পৌঁছেছিল। বাকিগুলো গেছে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যত্র। এদিকে বইটির চাহিদা রয়েছে। অথচ যোগান নেই। তাই এত বছর পর এ নতুন সংস্করণটি বরাক উপত্যকা থেকেই প্রকাশনের ইচ্ছা ছিল এবং সৃজন পাবলিশিং হাউসের পুণ্যপ্রিয় চৌধুরী প্রস্তাব দিলে আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করলাম।

বিগত প্রায় দুইটি দশকে আমাদের এদিকে লেখালেখির জগতে নানা পরিবর্তন ঘটেছে; শিলচর করিমগঞ্জ থেকে বেশ ক'টি দৈনিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ, একটু একটু করে গ্রন্থপ্রকাশ এবং বইমেলাকে কেন্দ্র করে বই বিপণনের বিস্তার ঘটছে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই দশকও এ অঞ্চলে লেখালেখির এবং মুদ্রণ জগতে কিছু প্রভাবও ফেলেছে। মুদ্রণ মাধ্যমের সম্ভাবনার ক্ষেত্রটা যদিও কিছুটা উন্মোচিত হয়েছে, শ্রুতিমাধ্যম অর্থাৎ রেডিও টিভির জগৎটি কেমন যেন সঙ্কুচিত হতে চলেছে। সাপ্তাহিক কথিকা, ম্যাগাজিন, ফিচার, সাহিত্য বাসর, এমনকী প্রাত্যহিক Spoken word-এর অনুষ্ঠানগুলো এক সময় এ অঞ্চলে নতুন লেখকদের টেনে এনেছে, প্রতিষ্ঠিতদের চর্চার ধারাটি অব্যাহত রেখেছে বর্তমানে তা প্রায় স্তিমিত। রেডিওকে কেন্দ্র করে নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক, লোকসংস্কৃতিবিদ, কবি, গীতিকার, বাচিক শিল্পীর যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বর্তমানে এ প্রক্রিয়া প্রায় স্তব্ধ। টিভি মাধ্যমও লিখনকর্মকে এগিয়ে দেয়, এখানে এ মাধ্যমটিও প্রায় ভূমিকাশূন্য। বলতে দ্বিধা নেই বর্তমান লেখকের একাধিক প্রবন্ধের উৎসভূমি আকাশবাণী। এতে প্রচারিত কথিকা সংকলিত করে সংগীত বিষয়ক একটি পুরো বইই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে, 'আজকের শ্রোতার বাংলা গান'। 'কী করে লিখব' বইটির একটি বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে এই রেডিও মাধ্যমের সঙ্গে লেখালেখির সূত্রে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতার নির্যাস। বাঙালির তিনটি ভুবনেই এই শক্তিশালী শ্রুতিমাধ্যমের সৃজনশীল প্রভাব আজ ইতিহাস। আমার বিশ্বাস এ মাধ্যমটির পুনরুজ্জীবন বাঙালির সৃজনশীলতার নতুন ক্ষেত্রগুলোকে উন্মোচিত করবে। নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আজও রেডিও মাধ্যম লেখকদের রচনাকৃতি নগদ মূল্যে ক্রয় করে নেয়, তা সে লেখক শিশুকিশোর আসরের আমন্ত্রিতই হোন, বা

যুববাণী কিংবা এর পরবর্তী স্তরের অর্থাৎ General Program-এর আমন্ত্রিত লেখকই হোন না কেন।

আরেকটি কথা, আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে 'মাস কমিউনিকেশন' চালু হলেও এতে যে ভাষায় পাঠদান এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা তো ইংরেজি। এ পাঠক্রম অতি অবশ্যই জাতীয় স্তরের বৈদ্যুতিন এবং প্রিন্ট মাধ্যমের উপযোগী লেখক তৈরি করলেও স্থানীয় কিংবা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমগুলোর উপযুক্ত কর্মী তৈরি করতে কতটুকু সহায়ক তাও সন্দেহ। বাংলা ভাষায় সাহিত্য, সাংবাদিকতা, নাটক রচনা, রেডিও টিভির স্ক্রিপ্ট রচনার উপযুক্ত প্রশিক্ষণের তো কোন সংস্থান এখনও নেই। বর্তমান লেখকও ইন্দিরাগান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে যে পাঠ নিয়েছেন তাও ইংরেজিতে, অথচ আজীবন কাজ করতে হচ্ছে বাংলা পত্রপত্রিকা, রেডিও, টিভিতে। যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির (ভাষা আকাদেমি, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন) পক্ষে গবেষণা প্রকল্পগুলো পরিচালনা করতে হয়েছে, 'আকাদেমি পত্রিকা' সম্পাদনা করতে হয়েছে এ সবই বাংলা ভাষায়। এ প্রেক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু অনিবার্য সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সচেতনতাই এ বইটি রচনার অনুপ্রেরণা।

বিগত দিনগুলোতে অনেক লেখক, সাংবাদিক, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকরা এ বইতে তাদের অনেক সমস্যার সমাধান খোঁজার প্রয়াস পেয়েছেন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানী সুজিৎ চৌধুরী এ বই নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী হীরেন গোঁহাই তাঁর একটি কলমে এ বইয়ের প্রশংসা করেছেন, অধ্যাপক রজৎ ভট্টাচার্য একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধও লিখেছেন এ বই নিয়ে, আর আমার ছাত্রছাত্রীরা তাদের পঠনের বিভিন্ন স্তরে এ বইটি ব্যবহার করেছেন—এ কথারও উল্লেখ থাক এখানে। আরেকটি উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না, তা হল আমার অশীতিপর মাতৃদেবী বইটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই একেবারে গোগ্রাসে গিলে একটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র লেখেন। বৃদ্ধ বয়সে একেবারে টেকনিক্যাল একটি বই কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি বা প্রশিক্ষণবিহীন সাহিত্য অনুরাগী (তিনি অবশ্য কবিতা গল্পও লিখতেন) পাঠিকা যে সহ্য করতে পেরেছেন এটা আমার কাছে বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক।

প্রথম প্রকাশের মুদ্রণ প্রমাদ এবং খুঁটিনাটি কিছু ভ্রান্তি সংশোধন এবং এখানে ওখানে ফুটনোট দিয়ে সামান্য আপ-ডেট করে দেওয়া ছাড়া কোন সংযোজন, পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। তবে এ সংস্করণে প্রয়োজনীয় কিছু ফটোগ্রাফ সংযোজন করা হল।

লেখক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পর্ব : এক	
প্রসঙ্গ লেখালেখি	১৩
কেন লিখি	১৪
রচনার বিভাজন : সৃজনশীল রচনা, ব্যবহারিক রচনা	১৫
কী ক'রে লেখা শেখা যায়	১৯
লিখতে হলে	২১
পর্ব : দুই	
লেখার সন্ধানে	২৫
বিষয়বস্তু	২৫
আঙ্গিক	২৬
পরিসর	২৬
স্টাইল	২৭
লেখার জন্য পড়া এবং ...	২৭
বই পড়া, বই দেখা	২৯
বানান নিয়ে, ভাষা নিয়ে দুচার কথা	৩২
পর্ব : তিন	
অ্যাকাডেমিক রচনার পদ্ধতি	৩৭
পর্ব : চার	
সমালোচনা	৫২
প্রসঙ্গ সমালোচনা	৫২
সমালোচনা লিখতে হলে	৫৫
গ্রন্থ সমালোচনা	৫৮
কয়েকটি রিভিউ পর্যালোচনা	৫৯
রিভিউ 'শয়তানী পদাবলি'	৬৪
শিল্প সমালোচনা	৬৮

রেডিও-টিভি সমালোচনা ৬৯
অবিচ্যুয়ারি লিখন ৭০

পর্ব : পাঁচ

রেডিও-টিভির স্ক্রিপ্ট ৭৪
বৈদ্যুতিন মাধ্যম, কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা ৭৪
এদের ভাষা আলাদা, ভঙ্গিও ৭৬
প্রসঙ্গ রেডিও-স্ক্রিপ্ট ৭৭
কথিকা ৭৮
পরিক্রমা, রেডিও-ম্যাগাজিন, ফিচার বা ডকুমেন্টারি ৮১
রেডিও নাটক ৮৫
টিভি-স্ক্রিপ্ট রচনা : প্রাসঙ্গিক কথা : টিভি এবং লেখক ৯০
ক্যামেরার ভাষা ৯২
এ আলোতে এ আঁধারে ৯৩
শব্দ ও ধ্বনি ৯৩
টিভি-স্ক্রিপ্ট রচনার তিনটি স্তর ৯৩
টিভি-ডকুমেন্টারি ৯৫
একটি টিভি-ডকুমেন্টারির স্ক্রিপ্ট : 'আবার আসিব ফিরে' ১০১
শেষের পাতা ১০৮

সহায়ক বই, পত্রপত্রিকা
নির্ঘন্ট

পর্ব ১

প্রসঙ্গ লেখালেখি

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে এক শিল্পী। কিন্তু তবুও 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি', অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোকেরই সেই সুপ্ত শিল্পী সত্তার বিকাশ ঘটে– এরাই হয়ে ওঠেন লেখক, শিল্পী, চিত্রকর।

তবে আমরা সবাই জন্মসূত্রেই কিছুটা সৃজনশীলতার অধিকারী। এর উপর রয়েছে পরিবেশ, পরিপার্শ্ব, শিক্ষা এবং অনুশীলন, যা এ সৃজনশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

মা'র কোলেই আমরা কথা বলা শিখতে থাকি, কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ রপ্ত করি। পরবর্তীতে এই বাক্য উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপণকে পরিশীলিত করে আমরা হতে পারি সুবক্তা, কথক, আবৃত্তিকার– সুরের সাধনায় গেলে– গায়ক। হাঁটি হাঁটি পা পা করে শুরু করে একদিন আমরা হয়ে উঠি খ্যাতিমান খেলোয়াড়। কাগজে রঙ-তুলির আঁকিবুকি করতে করতে হয়ে উঠি সত্যিকারের চিত্রকর। এমনি করে এক একটি স্তর অতিক্রম করে একজন শিল্পীর আত্মপ্রকাশের পেছনে রয়ে যায় জন্মসূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীকে সচেতনভাবে লালন করার দীর্ঘ ইতিহাস।

একটি শিশুর একজন চিন্তাশীল, সংবেদনশীল যুবকে পরিণত হয়ে ওঠার মধ্যে, কিংবা একজন যুবকের স্রষ্টা হয়ে ওঠার মধ্যে থাকে দীর্ঘদিনের সচেতন প্রয়াস, একটি গভীর গভীরতর প্রচেষ্টা যার মাধ্যমেই সম্ভব হয় তাঁর চিন্তা এবং কল্পনার শৈল্পিক প্রকাশ।

একজন চিত্রকর যেমন বহুদিনের প্রচেষ্টায় রঙ ও তুলির মাধ্যমে তাঁর অনুভবের প্রকাশ ঘটান, একজন গায়ক যেমন দীর্ঘদিনের সাধনায় তাঁর অনুভূতিকে সংগীতে মূর্ত করেন, ঠিক তেমনি একজন লেখকও দীর্ঘদিনের অনুশীলনে, সচেতন প্রয়াসে শব্দ ও ভাষার মাধ্যমে একটি রচনাকৃতির জন্ম দেন।

কেন লিখি

আমরা লিখি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য, পারস্পরিক কুশল মঙ্গল বিনিময়, শুভেচ্ছা বিনিময়, সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য— এর মাধ্যম হল চিঠি। এর উপর যখন আরো গভীর কিছু, আরো সূক্ষ্মতর কিছু প্রকাশ করতে চাই তখনই খুঁজে নিই আরেকটি মাধ্যম— কবিতা, গল্প কিংবা নাটক। চিঠিই হোক বা অন্য কোন রচনামাধ্যমই হোক, আমরা সততই নিজেকে 'প্রকাশ' করতে চাই; এবং প্রকাশভঙ্গির উপরই নির্ভর করে একটি লেখা নিছক সংবাদ হয়ে থাকবে, না হয়ে উঠবে একটি 'প্রকাশ'।

রবীন্দ্রনাথের গানের একটি পঙক্তিকে সামান্য নেড়েচেড়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক :

আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে
যখন বৃষ্টি নামল...

এখানে একটি সংবাদই উপস্থাপন করা হয়েছে– বৃষ্টি আসার সংবাদ, কোনও বিরাট কিছু নয়। কবি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন তাঁর অজান্তেই নেমেছিল বৃষ্টি। সামান্য এ কথাটি অতি সাধারণ ভাষায় উচ্চারিত হওয়া মাত্রই পাঠক/শ্রোতার মনে একটি গভীর অনুরণনের সৃষ্টি হয়ে গেল। রচনাটি লাভ করল ভিন্নতর মাত্রা। কবি অন্তরের একটি গভীর অনুভূতিকে বাইরে নিয়ে এলেন, শ্রোতাদের অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। তাই সংবাদটি হয়ে উঠল নিটোল এক কাব্য।

আসলে মানুষ লেখে নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি, চিন্তাকে নিজস্ব গণ্ডির ভেতর থেকে বাইরে, বৃহত্তর সমাজে পৌঁছে দেবার তাগিদেই। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন মানুষ অন্তরের জিনিসকে বাইরে, নিজেকে পরের কাছে, এক-কে বহুর কাছে, দেশীয়কে বিশ্বের কাছে, সাম্প্রতিককে সর্বকালের কাছে প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল। এই প্রকাশের ব্যাকুলতাই লেখার প্রধান অনুপ্রেরণা।

লেখা বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে একটি অপ্রতিরোধ্য তাগিদ। কোনও মাস্টার মশাইয়ের তাগিদ নয়, সম্পাদকের তাগিদ নয়, তাগিদ নয় কোন বন্ধু বা প্রেমিকার–

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতর খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত, ক্লান্ত করে–

এ ক্লান্তি থেকে মুক্তির জন্যই মানুষ লেখে, নইলে যে তাঁর বাঁচা অসম্ভব। তবে অর্থ, কীর্তি খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্যও যে মানুষ লেখে এটাও সত্যি, যদিও পুরোপুরি সত্যি নয়। মহাকবি মিল্টন নিজেই স্বীকার করেছেন, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা হল Last infirmity of the noble mind, অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তিরও সর্বশেষ দুর্বলতা হল এই যশের আকাঙ্ক্ষা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অসীম প্রতিভার অধিকারী হয়েও খ্যাতির পেছনে কম ছোটেননি সারাটা জীবন। শতবর্ষে পদার্পণ করেও খ্যাতির মোহ কাটাতে পারেননি আমাদের প্রবাসী 'এক অজ্ঞাত ভারতবাসীর জবানবন্দী'র (Autobiography of an Unknown Indian) লেখক, যিনি নিজেকে সক্রেটিস, বার্নাড শ, রবীন্দ্রনাথ, বার্ট্রান্ড রাসেলের চাইতেও অধিক সৃজনশীল বলে ঘোষণা করছেন এ বলে যে, শতবর্ষে পৌঁছেও তিনি যে লিখনকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন, তা বিরল ঘটনাই। তথাপি, আমাদের মেনে নিতে বাধা নেই, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা লেখার মূল প্রেরণা কখনওই হতে পারে না।

অন্তরের তাগিদই লেখার প্রধান অনুপ্রেরণা। লেখা মানে একটি ভারমুক্তি, লেখা মানে নিজেকে ধ্বংস করা, লেখা মানে নিজেকে পুনর্নির্মাণ করা। লেখা মানে প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষে ফেটে পড়া, যেমন তসলিমা নাসরিন লিখছেন। নিজের সঙ্গেই অবিরাম কথা বলে যাওয়াও তো লেখা, যেমন লিখেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। কবি-প্রাবন্ধিক বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত বলেছেন– 'আমি লিখিনা, বাঁচি' (কী লিখি, কেন লিখি, পৃঃ ৭)।

রচনার বিভাজন : সৃজনশীল রচনা, ব্যবহারিক রচনা

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক– এগুলোকে সৃজনশীল রচনা বলে অভিহিত করা হয়। ইংরেজিতে বলা হয়, 'ক্রিয়েটিভ রাইটিং'। প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচনা, সংবাদ, ফিচার, ইতিহাস-সমাজ-জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাকে সাধারণভাবে ব্যবহারিক রচনা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ইংরেজি 'নন-ক্রিয়েটিভ' শব্দটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, 'নন-ফিকশন্যাল প্রোজ' কথাটি বরং যথাযোগ্য পরিচয় বহন করে এ ধরনের রচনার।

সৃজনশীল রচনার পেছনে থাকে লেখকের গভীর গভীরতর অনুভূতি, সূক্ষ্মতর চেতনার অভিঘাত, আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা। রচনাশৈলী, নির্মাণ কৌশল, আঙ্গিক সচেতনতা এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও সম্পূর্ণ রচনাটি পরিশেষে আঙ্গিকের বাঁধন ছাড়িয়ে পাঠককে আরো গভীরতর বোধ বা অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায়।

একটি সার্থক কবিতা যতটুকু প্রকাশ করে, ব্যঞ্জনা ছড়ায় তার চেয়ে আরও বেশি। অব্যক্ত কথাটি পাঠকদের মনে জাগিয়ে দেয় এই ব্যঞ্জনার মাধ্যমেই।

একটি সার্থক ছোটগল্প ঘটনা, চরিত্র, প্রেক্ষিত ও উপস্থাপনার মুনশিয়ানায় পাঠকদের মনকে করে দেয় সৃজনশীল। পাঠক নিজেই কখন হয়ে ওঠে স্রষ্টা, তা নিজেই বুঝতে পারে না।

সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছিলেন, একজন সার্থক শিল্পী কখনই পুরো ছবিটি এঁকে দেন না, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গায় তুলিটি ছুঁইয়ে যান, আর দর্শকদের চোখই তখন পুরো চিত্রটি সৃষ্টি করে নেয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকতে হলে কবিগুরুর ভুরুর প্রতিটি রেখা, চোখের কোণের ভাঁজ, দাড়ি গোঁফের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ফোটানোর প্রয়োজন নেই, কয়েকটি অর্থবহ সংকেত দিলে দর্শকরা নিজেরাই কবিগুরুকে খুঁজে পাবেন ক্যানভাসটিতে।

অতিকথন সৃজনশীলতাকে নষ্ট করে দেয়, কারণ পাঠক বা শ্রোতার জন্য এতে কোনকিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। সব কথা ফুরিয়ে নটে গাছটি পর্যন্ত যখন লেখক মুড়িয়ে দিয়ে যান, তখন পাঠকদের রচনাটিকে ভুলে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

বোম্বাই বাজারের সিনেমায় পরিচালক তাঁর দর্শকদের ছবিটির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিঁখুতভাবে বুঝিয়ে দেন। কোনও সংকেতের প্রয়োগ থাকলে তাও পুনঃপুনঃ দেখিয়ে না-বোঝার সম্ভাবনাটি দুর করেন অতি নিষ্ঠাভরে। যেমন, নববধূ ঘরে আসার মুহূর্তে একটি কালো বেড়ালের হঠাৎ আবির্ভাব। বিষয়টি যে একটি অমঙ্গলের বার্তাবাহী, এটা স্পষ্ট করে বোঝাতে গিয়ে পরিচালক পরবর্তী শটে বেড়ালের পা লেগে মঙ্গলঘটটি পড়ে ভেঙে যাবার দৃশ্যটিও দেখিয়ে দেন। দর্শকদের আর কোন সন্দেহ থাকে না– একটা অমঙ্গল ঘটতে চলেছে নবদম্পতির জীবনে। দর্শকদের বোঝাবার এতটুকু দায়িত্ব নেওয়াতেই তো সমস্ত সমস্যা। ঘন্টা দুই প্রেক্ষাগৃহে বসে দর্শক হাই তুলতে তুলতে দেখেন পরিচালক তাঁর জন্য কিছুই বাকি রাখেননি– সব সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন, সবকটি সংলাপ দাঁড়ি, কমা সহ উচ্চারণ করিয়ে দিয়েছেন, মানেও বুঝিয়ে দিয়েছেন কথাগুলোর– এবং এজন্যই এত অর্থশ্রম ব্যয় করেও ছবিটি একটি সস্তা বাণিজ্যিক পণ্য ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠেনি।

বটতলা সিরিজের সস্তাদরের উপন্যাস, পঞ্জিকার পাতায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যায় পাঠক সংগ্রহ করা হয়– মফঃস্বলের লাইব্রেরি আলো করে থাকে রঙিন মলাটের যে বইগুলো– এগুলোও ঠিক তাই। একশ্রেণির পাঠকের আনুকুল্য লাভ করলেও সাহিত্যের অঙ্গনে এরা প্রবেশ লাভ করতে পারে না।

আমরা সৃজনশীল রচনা এবং ব্যবহারিক রচনা প্রসঙ্গে ফিরে আসি–। একটি রচনা সৃজনশীল বা ব্যবহারিক, তা কখনই ব্যক্তিনির্ভর নয়, বিষয়নির্ভর। একজন কবি কিংবা ঔপন্যাসিকের কলম দিয়ে ফুটবল ম্যাচের একটি নিখুঁত প্রতিবেদন বেরিয়ে আসতে পারে, একজন রাজনৈতিক প্রতিবেদক অসাধারণ উপন্যাস লিখেছেন এমন দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যেই প্রচুর। মননশীল প্রাবন্ধিক, ইতিহাস-গবেষকের কলম দিয়েও অনেক উন্নতমানের কবিতা কিংবা উপন্যাস বেরিয়েছে।

সমালোচনা, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, ভ্রমণ, জীবনী, স্মৃতিচারণ গ্রন্থ– এগুলোকে প্রথমোক্ত শ্রেণিতে ফেলা যাবে না। কিন্তু ব্যবহারিক রচনা বলেও অভিহিত করা যাবে না।

'মননশীল' শব্দটি সম্ভবত এখানে যুক্তিযুক্ত হবে। এসমস্ত ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার ঘাটতি হলে রচনার উৎকর্ষ বাধাপ্রাপ্ত হবে। এগুলোর রচনামূল্যই থাকবে না। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে Lord Acton-এর একটি কথার সমর্থন করে বলেন– "ঐতিহাসিক শুধু একজন নিপুণ বিশ্বকোষের জন্য তথ্য-সংকলক মাত্র যেন না হয়ে বসেন। তাকে কিছু পরিমাণে হতে হবে, 'a man of letters', শুধু সংগ্রাহক আর তথ্যের 'স্টেনোগ্রাফার' হলে চলবে না (দেশ, ২মে, ১৯৯৮, পৃঃ ১৯৯)। অর্থাৎ, ঐতিহাসিককে একজন সাহিত্যিকও হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু এখানেও একটি সীমারেখা টানতে হবে নির্মমভাবে।

চার্লস ডিকেন্স ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে লিখেছেন উপন্যাস, 'এ টেল অব টু সিটিজ', যার তথ্য নিয়েছেন কার্লাইলের ইতিহাস বই থেকে। এ উপন্যাসে ডিকেন্স ঔপন্যাসিক হিসেবে যতটুকু স্বাধীনতা নিয়েছেন, তা তাঁর রচনার সৌকর্য্য বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু ইতিহাস রচনায় কার্লাইলের ক্ষেত্রে তা হতো মারাত্মক। আবার কার্লাইল যে সব তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, ডিকেন্সও যদি এরকম তথ্য বইটিতে ঠেসে দিতেন– তবে দীর্ঘ পরিসরের এ উপন্যাসটি পাঠককে শুধু ক্লান্তই করত, উজ্জীবিত করত না কোন মতেই।

একটি 'নন-ফিকশন্যাল-গদ্য' গ্রন্থ যদি তথ্যপূর্ণ অথচ ভাবাবেগ শূন্য, সাদামাটা, প্রয়োজনের চাইতেও বেশি সিরিয়াস হয়ে ওঠে তবে তা একবারে আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠবে 'নন-ক্রিয়েটিভ' যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র, থিসিস, সেমিনার পেপার– যার ব্যবহারিক মূল্য আছে কিন্তু পাঠ-মূল্য নেই। এসব রচনা পাঠককে বিজ্ঞ করে তুলতে পারে, কিন্তু প্রাজ্ঞ করতে পারে না; সচেতন করতে পারে, কিন্তু উজ্জীবিত করতে পারে না। মানুষ অন্তরের তাগিদে এব বইয়ের পাতা ওল্টাবে না, কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োজনে এসব বই নিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাবে।

গিবনের 'রোমক সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংস' তাভের্নিয়ারের 'ভারতভ্রমণ', আল বেরুণির 'কিতাব-উল-হিন্দ', নেহেরুর 'ডিসকভ্যারি অব ইণ্ডিয়া' কিংবা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারত-সংস্কৃতি'– এই বইগুলোর সাহিত্যিক মূল্য এদের ঐতিহাসিক মূল্যের চাইতে কোনও অংশেই কম নয়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কোন্ রচনা সৃজনশীল আর কোন্‌টি ব্যবহারিক, তা ব্যক্তি-নির্ভর নয়, বিষয়-নির্ভর। দেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি-শিক্ষা নিয়ে লিখতে হলে লেখককে অতি অবশ্যই প্রবন্ধ বা নিবন্ধ আঙ্গিকেই লিখতে হবে এবং নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি, কল্পনাকে সংহত করে নিতে হবে বিষয়ের স্বার্থেই। সে সঙ্গে তাঁকে হতে হবে যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যনিষ্ঠ এবং নৈর্ব্যক্তিক। সৃজনশীল রচনা হিসেবে দাবি করতে পারবে না এসব রচনা। এখানে ভাষার চমৎকারিত্ব, ভাবাবেগের প্রকাশ এবং কল্পনা অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ক্ষতিকারকও। দৈনিক পত্রিকার সংবাদ রচনা উচ্ছ্বাসপূর্ণ অতিকথন হয়ে উঠলে তা সম্পূর্ণ অ-সার্থক রচনাই হবে।

অপরদিকে, কথা-সাহিত্য যদি থাকে যুক্তি তর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ, তথ্যের ভারে ন্যুব্জ এবং এর প্রকাশভঙ্গি হয় জার্নালিস্টিক, তবে তা সৃজনশীলতা হারাবে।

অবশ্য এরও ব্যতিক্রম রয়েছে। একগুচ্ছ চিন্তা নিয়েই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্থক উপন্যাস 'শেষ প্রশ্ন'। ঘটনা নয়, অ্যাকশন নয়, শুধুমাত্র চিন্তা, শব্দ, বাক্য নিয়ে বার্নাড শ'র নাটকগুলো যেমন মঞ্চসফল তেমনি পাঠযোগ্যও। এন্টি-প্লট, এন্টি-হিরো গল্পও সার্থক ছোটগল্প।

আধুনিক উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতায় কল্পনা-আবেগ-অনুভূতিকে দূরে সরিয়ে রাখার সচেতন প্রয়াস সত্ত্বেও পাঠক-মনকে নাড়া দেয়, হয়ে ওঠে মর্মস্পর্শী। 'আবেগের প্রকাশ নয়। আবেগ থেকে মুক্তিই কবিতা'– এরকম ফরমান জারি করেও ইংরেজ কবি চিমনীর খোঁয়া, কানাগলির বেড়াল, নিঃসঙ্গ পুরুষমানুষ, কাগজকুড়ানো বুড়ি, পোড়া মাংসের গন্ধে-ভরা সকালবেলা নিয়ে যে কবিতা লেখেন, তা'ও তো রচনা নৈপুণ্যে আমাদের মনকে নিবিড় ভাবে ছুঁয়ে যায়। এ থেকে আমরা নিঃসন্দেহে এ কথাটা মেনে নিতে পারি– বাঁধ ভাঙা আবেগের প্রকাশ আর সৃজনশীলতা এক নয়। আবেগ থেকে বিদায় নিলেও ('escape from emotion', Eliot) সৃজনশীলতা (creativity) বজায় থাকে। এলিঅট, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দের নিরাবেগ কবিতা যেখানে পাঠককে আবিষ্ট করে তুলতে পারে সেখানে ছন্দ-অলঙ্কারের প্রয়োগে মহৎভাবের উচ্চকণ্ঠ মফঃস্বলীয়-কবিতা (না পদ্য?) কাঁচা রসের ভিয়েন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবেগকে সংহত করে নিয়ে যে কী অসাধারণ রস সৃষ্টি করা যায়, তা দেখিয়েছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর 'পথের পাঁচালী'র একটি দৃশ্যে। পাঠকরা স্মরণ করুন হরিহরের গৃহ-প্রত্যাগমন এবং দুর্গার মৃত্যু সংবাদ পাবার দৃশ্যটি। সর্বজয়া দুর্গার জন্য আনা শাড়িটি স্বামীর হাত থেকে নিয়ে বুকের মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। হরিহরের মুখে কোনও সংলাপ নেই। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল– মৃদু আবহসংগীত সমস্ত পরিবেশকে করুণ করে তুলল। সমস্ত ঘটনার জন্য পরিচালক দু'তিন মিনিটের বেশি সময় নিলেন না। সামান্য শব্দ, দৃশ্য আর ধ্বনিতেই গভীর এক মর্মবেদনায় দর্শকদের আকুল করে দিলেন সত্যজিৎ রায়। একটি বাণিজ্যিক ছবির পরিচালক এরকম সিচুয়েশনে যে কত দীর্ঘ সংলাপ রাখতেন! দুঃখ প্রকাশের কত অঙ্গভঙ্গি– চুল ছেঁড়া, মাথা চাপড়ানো, পটের দেবীর সঙ্গে সংলাপ, মৃত্যু বিষয়ক একটি লোকসংগীত– আরো কত কী যে থাকতো এরকম দৃশ্যে।

উনবিংশ শতকের রোমান্টিসিজমের প্রতিনিধি-কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, 'কবিতা হল বলিষ্ঠ অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ' ('spontaneous overflow of powerful feelings')। কিন্তু সে সঙ্গে তিনি এ কথাটি যোগ করতে ভোলেননি, 'it takes its origin in emotion recollected in tranquility'। অর্থাৎ প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে যে আবেগ শিল্পীর চেতনায় জন্ম নেয়, তা আরও একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শিল্প হিসেবে প্রকাশ লাভ করে। অর্থাৎ, শিল্পীমনে অনুভূতিটির পুনর্নির্মাণ হয়

নিভৃতে। অসংযত, অসংলগ্ন, বাঁধভাঙা আবেগের বহিঃপ্রকাশই 'সৃষ্টি' হতে পারে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর কোথাও আবেগের আতিশয্য নেই। রোমান্টিক বলে চিহ্নিত কবি কিটসের প্রতিটি পংক্তিই নিখুঁত, বাহুল্য ভাষাবেগ-বর্জিত অর্থাৎ ধ্রুপদী।

কোন্ রচনা সৃজনশীল আর কোন্টা নয়, এর উত্তর এত সহজ নয়। এটা প্রকৃতপক্ষে বিরাট বিতর্কের বিষয়ও– আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে এর বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই, অবকাশও নেই। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় ইতি টানার আগে পাঠকদের আবার মনে করিয়ে দিই– সৃজনশীল রচনায় আঙ্গিক সচেতনতা, সংযম, পরিমিতিবোধ, এবং কৃৎকৌশলের ঘাটতি থাকলে পাঠক তা প্রত্যাখ্যান করবে। আবার ব্যবহারিক রচনা যদি একেবারে সাদামাটা, নিরস তথ্যপঞ্জি হয়ে ওঠে– এতে যদি সৃজনশীলতার লেশ মাত্র থাকে না– তা'ও পাঠকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবে।

কী করে লেখা শেখা যায়

এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হবে, লেখা শেখা যায় না– 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'। তবু এই একই প্রশ্নের উত্তরে আবার বলব, অনুশীলনের মাধ্যমে লেখা শেখা যায়, অবশ্যই যদি...।

লেখার ক্ষমতা বা সৃজনশীলতা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতা হওয়া সত্ত্বেও এটা দেখা গেছে যে সচেতন প্রয়াসই একজন ব্যক্তিকে লেখক কিংবা শিল্পীতে রূপান্তরিত করে। শুধুমাত্র ক্ষমতা থাকলেই হয় না– অনুশীলন চাই, চাই নিরন্তর প্রচেষ্টা। আবার গভীর অনুশীলন বা প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেই হয় না, সহজাত ক্ষমতাটি থাকাও চাই।

বিশ্বের প্রাচীন কিংবা আধুনিক, সব যুগেরই শ্রেষ্ঠ লেখকরা দেখা গেছে স্ব-শিক্ষিত– 'জন্মসূত্রে লেখক' কথাটিতে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি রয়ে গেছে– স্ব-শিক্ষিত শব্দের ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। নিজের সম্বন্ধে জর্জ বার্নাড শ বলেছেন যে, তাঁর লেখক হবার পেছনে বিদ্যালয়ের কোন ভূমিকা নেই। পাঠ্যবই পড়ে তিনি লেখা শেখেননি, কারণ ওই বইগুলো যারা লিখেছেন তারা লেখা জানেন না। বার্নাড শ প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ গ্রহণ করেননি সত্যি, কিন্তু শুয়ে বসেই যে সার্থক নাট্যকার হয়ে গেছেন তা তো নয়। যে মহাকবি শেক্সপিয়রকে শ তাঁর প্রতিপক্ষ ভাবতেন সেই কবি-নাট্যকারও নাকি রঙ্গমঞ্চের একজন কর্মী হিসেবেই জীবন শুরু করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (University wit) তিনি ছিলেন না সত্যি, কিন্তু তিনি যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস দর্শনের চর্চা করেননি, তা কি আমরা জোর করে বলতে পারব?

আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্কুলে না-যাওয়াদের দলে। কিন্তু তা বলে দৈবানুগ্রহেই তিনি বিশ্বকবি হয়ে গেছেন তাও তো নয়। বালক কবির সহজাত কাব্য প্রতিভা স্ফুরণে গৃহশিক্ষকদেরও কিছু ভূমিকা ছিল। ছন্দ-মিলিয়ে কথার পিঠে কথা গেঁথে

কবিতা রচনার অনুশীলনের কথাও আমরা কবি জীবনীতে পাই– কীভাবে শিক্ষক লিখে দিয়েছেন দুটি পংক্তি আর পরবর্তী পদ পুরণ করে দিচ্ছেন শিশু রবি–

(ক) রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই। (শিক্ষক-কৃত)

(খ) মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে (কবি-কৃত)

বাল্মীকির কাব্য-স্ফুরণ অবচেতন ভাবে ঘটলেও মিল্টন বা মধুসূদনের ক্ষেত্রে তা ছিল সচেতন-প্রয়াস। কিন্তু মহাকাব্যের রচয়িতা হিসেবে তিনজনের মধ্যেই সৃজনশীলতার প্রকাশ বিদ্যমান। টি. এস. এলিঅট কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক না হলেও বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা, Criterion-এর সম্পাদনা করতেন ব্যাঙ্কে চাকরির সঙ্গে সঙ্গেই। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, শঙ্খ ঘোষ একাধারে কবিতার সমালোচক, গবেষক, শিক্ষক এবং রচয়িতাও। এদের রচনা-প্রয়াস প্রধানত সচেতন-প্রয়াসই। কিন্তু হাসন রাজা বা লালন ফকির পদ লিখেছেন ভেতরের অনুপ্রেরণায়, পদ্য লিখব বলে দীর্ঘ সাধনার পর নয়, নিশ্চিতভাবেই।

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই সাহিত্য-রচনার পাঠক্রম চালু হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে লেখালেখি শেখানো হয়। আমাদের দেশেও সম্প্রতি এ পাঠক্রম চালু হয়েছে– 'ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশন্যাল ওপেন ইউনিভার্সিটি (IGNOU)-তে CRW অর্থাৎ Creative Writing, কিংবা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে Mass Communication-এ ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি। এর সুফল কতটা হয়েছে তা মূল্যায়নের সময় এখনও হয়নি, তবে অনেক লেখক, কবি, সাংবাদিক, নাট্যকার, চিত্রনাট্যকার, বেতার-টিভির স্ক্রিপ্ট লেখক এমনকী কথা-সাহিত্যিকও এতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, নিচ্ছেনও। অকাল-প্রয়াত ইংরেজ কবি সিলভিয়া প্ল্যাথও এরকম একটি প্রতিষ্ঠানে রচনা-শিক্ষার পাঠ নিয়েছেন। তাঁর কাব্য-প্রতিভা আজ প্রশ্নাতীত।

সংগীতের মত সূক্ষ্ম শিল্প-মাধ্যমটি যদি সচেতন প্রয়াসে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, চিত্রশিল্পও যদি পাঠক্রম অনুযায়ী অনুশীলনে আয়ত্তাধীন, তবে লেখা-কর্মটিই বা কেন চেষ্টা করে শেখা যাবে না?

কিন্তু, এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, যার গলায় সুরই নেই, তাকে তো আর শিখিয়ে পড়িয়ে গায়ক বানানো যাবে না। কিংবা প্রকৃতি, পরিবেশ, কঠিন বাস্তবের অন্তর্নিহিত চিত্রময় পৃথিবীর রূপ দেখার সেই চোখই যার নেই, তাঁকে তো আর জোর করে চিত্রশিল্পী বানানো যাবে না। আবার, গলায় সুর থাকলেই যে গায়ক হওয়া যায়, প্রকৃতির মাঝে রঙের বৈচিত্র্য লক্ষ করার ক্ষমতা থাকলেই যে চিত্রকর হওয়া যায়, তাও তো সত্যি নয়। ঠিক তেমনি, সহজাত সৃজনশীলতা থাকলে, গভীরভাবে অনুভব করার সংবেদনশীল মন,

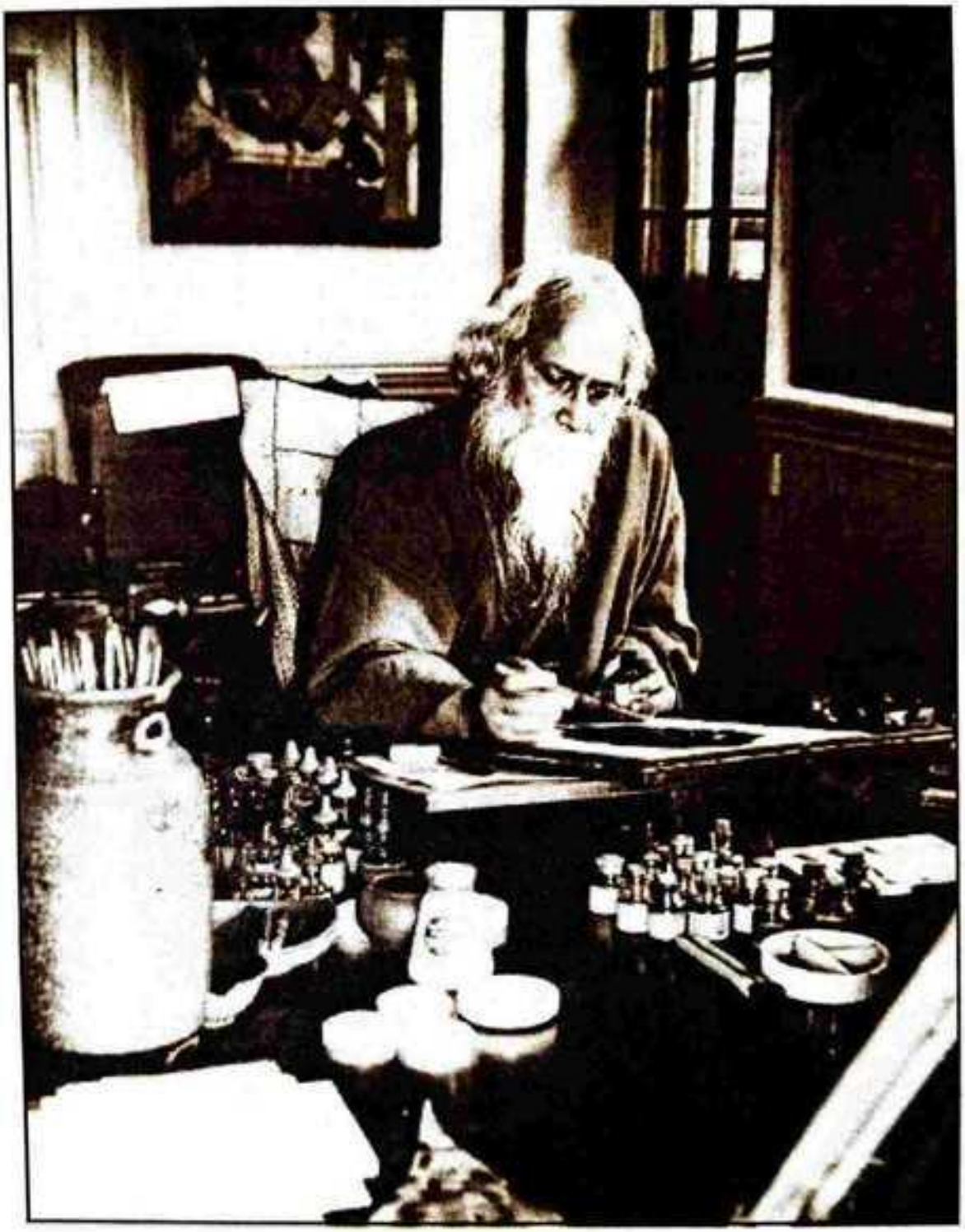

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৬১-১৯৪১)

কিংবা যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অথবা সাহিত্য-শিল্পে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেই যে লেখক হওয়া যায়, তাও কখনো সত্যি নয়। স্বাভাবিক ক্ষমতাকে অনুশীলনের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গেলেই সাফল্য লাভ করা সম্ভব। অতএব, কী করে লেখা শেখা যায়, এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলতে পারি, যথোপযুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে, সচেতন প্রয়াসে লেখার ক্ষমতা অর্জন করা যায়, অবশ্যই যদি ভেতরে কিছুটা স্বাভাবিক প্রবণতা, শিল্প চেতনা, সৌন্দর্যবোধ এবং অনুপ্রেরণা থাকে।

লিখতে হলে...

অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ, অভিজ্ঞতা পরোক্ষ

লিখতে হলে কী করতে হবে, এ প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর নেই। বিশ্বের অলসতম ব্যক্তির পক্ষেও চমৎকার ভ্রমণকাহিনি রচনা সম্ভব। আবার প্রচণ্ড ব্যস্ত ব্যক্তির পক্ষেও নির্জনতার কবিতা রচনা অসম্ভব নয়।

হ্যাঁ, লিখতে হলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন। তবে এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পদ্ধতিটি কী, এটা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। আমরা প্রতিদিন যা দেখি এর সবই যে আমাদের অভিজ্ঞ করে তোলে তা নয়; অর্থাৎ আমাদের দেখা সবসময় 'দেখা' হয়ে ওঠে না। তেমনি আমাদের সমস্ত অনুভবও আমাদের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে জমা পড়ে না।

আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারি প্রত্যক্ষভাবে দেখে। তেমনি প্রত্যক্ষভাবে না-দেখে– অন্যের বই পড়ে, গল্প শুনে, ছবি দেখেও আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি। সমস্ত অভিজ্ঞতা নিজে অর্জন করা কখনই সম্ভব নয়; অতএব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যেতেই হবে। আর অপরের লেখা বই পড়ে, গল্প শুনে, ছবি দেখেও যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করতে পারি, তা যদি খাঁটি হয়, তবে তাকে আর পরোক্ষ বলে দূরে সরিয়ে দেওয়াও যাবে না।

কলকাতা নগরীর ইট-কাঠ-পাথরের খাঁচার মধ্যে বাস করেও গ্রামজীবনের গন্ধমাখা সাহিত্য রচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকরা। গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসেও আধুনিক নগর জীবনের কথাসাহিত্য রচিত হয়েছে বিস্তর।

মোট কথা হ'ল, লেখককে নিজস্ব গণ্ডির ভেতর কিংবা বাইরের জগতটিকে খুব নিবিড় ভাবে আত্মস্থ করে নিতে হবে যদি তা থেকে লেখার বিষয়বস্তু খুঁজে নিতে হয়। এ কাজটি যদি সঠিকভাবে করে নেওয়া যায়, পাঠকরা তবে আর রচনাটির বাস্তবতা নিয়ে সন্দিহান হবার অবকাশই পাবেন না।

জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতাকেই ধরা যাক্–

সাগরের ওই পারে– আরো দূর পারে
কোন এক মেরুর পাহাড়ে

এইসব পাখি ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের পর
নেমেছিল তারা তারপর– (পাখিরা)

এ যে একেবারে হাল আমলের 'ন্যাশনেল জিওগ্রাফিক'-এর ডকুমেন্টারি ছবি। পাহাড়, সমুদ্র, আকাশ, বাতাস, ঝড়ের আঘাতে ছুটে চলা পাখির দল– বাস্তব-অবাস্তবে মেশানো অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। পাঠকরা কবির বর্ণনাকে 'অবিশ্বাস করতে অক্ষম' হয়ে যান। এই 'Willing suspension of disbelief' প্রক্রিয়াটি ক্রিয়াশীল হয়েছে কবির নিবিড় ও আন্তরিক অনুভূতির জোরেই– এখানে প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ অভিজ্ঞতার বেড়াজাল নেই।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের সৃষ্ট সবক'টি চরিত্রই যে ওঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন একথা কেউই বলবেন না। এরা একই সঙ্গে লেখকের দেখা এবং না-দেখাও বটে। প্রত্যক্ষভাবে দেখা চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছে লেখকদের নিজস্ব কল্পনা; আবার কাল্পনিক চরিত্রকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে দেখা কোনও জীবন্ত চরিত্রের সঙ্গেও।

মাঝিদের কথা লিখতে হলে নিজেকে মাঝি হতে হয় না, সাঁওতালদের নিয়ে লিখতে হলে নিজে সাঁওতাল হবার কোন প্রয়োজন নেই।

মানুষের মন এমনই এক পরমাশ্চর্য ক্ষেত্র যে, যে-কোন কিছুই এতে আত্মস্থ হয়ে যেতে পারে, যদি আন্তরিক প্রয়াস থাকে।

বরাক উপত্যকার সাহিত্য জগতের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক্। এখানেও লেখা নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে নিরন্তর। শহর ছেড়ে গ্রামে, পল্লিতে, শহরতলিতে ঘুরছেন কেউ কেউ গল্পের থিম খুঁজতে, কবিতার ভাষা খুঁজতে– আর শহরের বুকে বসেই দেবব্রত চৌধুরী চা বাগিচার মিশ্র ডায়লেক্টে সার্থক নাটক লিখে ফেললেন (কুঠার); জংলি হাতির তাড়া খাওয়া তো দূরের কথা, হাতির একটি প্রাণঘাতী ডাক শোনার অভিজ্ঞতা না নিয়েও পরোক্ষ সংবাদ সংগ্রহ করে, ডায়লেক্ট রপ্ত করে, নিজস্ব সৃজন-প্রতিভার বলেই চিত্র ভানু ভৌমিক লিখতে পারেন 'জঙ্গল জঙ্গল'-এর মত নাটক। এর ঠিক বিপরীতেই আমরা পাচ্ছি গল্পকার বদরুজ্জামান চৌধুরীকে, যিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই গল্পের থিম খুঁজে নেন। গ্রামকাছাড়ের অশিক্ষা-কুশিক্ষা-ধর্মীয় গোঁড়ামি-মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তাঁর গল্পে সরাসরি উঠে আসে। চরিত্রগুলোর মধ্যে যেমন কোন কৃত্রিমতা আরোপ করেন না তিনি, তেমনি গ্রামীণ চরিত্রগুলোর মুখে কেতাবি ভাষাও তিনি বসিয়ে দেন না। কিন্তু অপরিশীলিত গ্রাম্যতা দোষে দুষ্টও নয় তাঁর রচনাকৃতি। 'জাগরণ', 'ছোটলোক', 'ইদ্রিস মিঞার আত্মদর্শন', 'ফুলজান বিবির কথামালা'– গল্পগুলো পাঠ করলেই বাস্তব অভিজ্ঞতা কীভাবে শিল্পের অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, তা বোঝা যায়।

মলয়কান্তি দের 'আশ্রফআলীর স্বদেশ', দেবব্রত চৌধুরীর 'আব্বাজানের হাড়', শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর 'মানুষ মানুষের জন্য'– এ গল্পগুলোর ঘটনা, চরিত্র এবং কাল

আমাদের অভিজ্ঞতার খুব কাছাকাছি– তাই গল্পকারদের গল্পগুলোর 'টেকনিক' নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষাও করতে হয়নি– অথচ এগুলোকে সার্থক আধুনিক ছোটগল্প বলতে বাধা নেই।

কবিতা বা কথাসাহিত্য রচনার জন্য যে ধরনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অন্যান্য গদ্য– প্রবন্ধ বা নিবন্ধ রচনার জন্য ঠিক সে ধরনের অভিজ্ঞতার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। গদ্য রচয়িতার অভিজ্ঞতা অনেক অনেক বেশি বিষয়ভিত্তিক, বাস্তবানুগ এবং শ্রম (labour) সাপেক্ষ। গদ্য লেখার জন্য পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, পাঠ, ভ্রমণ, গবেষণা এসব একেবারে আবশ্যিক। এযুগে একজন প্রাবন্ধিককে চার্লস ল্যাম্বের মত মোম জ্বালিয়ে নির্জন ঘরে বসলেই কিংবা কমলাকান্তের মতো আফিমের খোরাক নিয়ে চক্ষু বন্ধ করলেই চলবে না– তাঁকে ছুটতে হবে হাটে মাঠে ঘাটে, তথ্যের পেছনে ঘুরতে হবে অক্লান্ত শ্রমিকের মত– লাইব্রেরি থেকে মহাফেজখানা, মিউজিয়াম থেকে চিড়িয়াখানা সর্বত্র। তবে, সে সঙ্গে তাঁকে সঠিক প্রকাশভঙ্গিটিও আয়ত্ত করতে হবে, নইলে তাঁর রচনা পাঠযোগ্য হবে না, সাহিত্যকৃতি হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না।

অর্থাৎ, একজন প্রাবন্ধিক বা নিবন্ধকারকে একই সঙ্গে একজন শ্রমিক এবং শিল্পী হতে হবে–। তাঁকে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতা যেমন সঞ্চয় করতে হবে, তেমনি প্রয়োজনীয় প্রকাশভঙ্গিও আয়ত্ত করতে হবে। তবে, দেখা শোনা, পাঠ ও অনুধ্যানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়ে গেছে প্রকাশভঙ্গি খুঁজে নেওয়ার সূত্র। প্রকাশভঙ্গি আগে, না অভিজ্ঞতা আগে– এর উত্তরে বলব বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এক অর্থে প্রকাশভঙ্গি আয়ত্তের প্রক্রিয়াও। কারণ, রচনার বিষয়ই লেখককে সঠিক পদ্ধতির দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

লেখকদের তাই লিখতে লিখতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে, এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতেই লিখে যেতে হবে।

প্রথম পর্বের শেষ কয়েকটি কথা মনে রাখা যাক্ :

- মানুষ শুধু খেয়ে পরেই বাঁচতে পারে না– তাঁর মানসিক চাহিদার পূরণও আবশ্যক। এজন্যই শিল্প-সাহিত্যের প্রয়োজন। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে নিজের কাছে এবং সবার কাছে প্রকাশ করে– এ প্রকাশই শিল্পের প্রধান অনুপ্রেরণা।
- অতীত কাল বর্তমানের কাছে পৌঁছেছে মূলত লিখিত-সাহিত্যকে অবলম্বন করেই। সাহিত্য তাই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনপ্রক্রিয়ার মধ্যে অন্যতম এবং সাহিত্য সৃষ্টি মানুষের প্রাথমিক কাজগুলোর অন্যতম।
- আমরা লিখি অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তির জন্য নয়, অন্তরের তাগিদে।
- লেখাকে সৃজনশীল এবং ব্যবহারিক– দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সৃজনশীল রচনার মুখ্য উপজীব্য হ'ল প্রকাশ, ব্যবহারিক রচনার হ'ল প্রচার; সৃজনশীল রচনার অভীষ্ট হ'ল অনুভব-চিন্তা-চেতনা এবং ভাবের প্রকাশ; কিন্তু ব্যবহারিক রচনার

অভীষ্ট হ'ল তথ্য সন্নিবেশ করা; সৃজনশীল রচনা হ'ল সৃষ্টি, ব্যবহারিক রচনা হ'ল নির্মাণ।

- লেখার ক্ষমতা যদিও প্রকৃতি প্রদত্ত, তবুও অনুশীলন, প্রচেষ্টা এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে লেখার কৌশল রপ্ত করা সম্ভব। কারণ, প্রত্যেকের ভেতরই শিল্প-প্রতিভা সুপ্ত থাকে কোনও না কোনও ভাবে।
- প্রতিটি লেখকই একজন পাঠক। নিজস্ব জগৎকে বিস্তৃত করতে, অনুভূতিকে শাণিত করতে, চিন্তা চেতনাকে সজাগ রাখতে, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিকে সহজ করে তুলতে, নিজের লেখক সত্তাকে বিকশিত করতে পড়াশুনা করতে হবে প্রচুর।
- যে কোনও ধরনের রচনাতেই– সৃজনশীল বা ব্যবহারিকই হোক্– লেখককে নিজের আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে সংহত করে নেবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। নইলে পরিমিতি বোধ থাকবে না, রচনা শুরু হলেও শেষ হবে না, শেষ হলেও বিশ্বাসযোগ্য হবে না, পাঠককে কাছে টানতে পারবে না।
- অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষের কোন বিভাজন নেই– অভিজ্ঞতাটি হওয়া চাই আন্তরিক এবং খাঁটি।
- লিখতে লিখতেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে; এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতেই লিখে যেতে হবে।

এ পর্যন্ত যারা এগিয়ে গেছেন, এরা এবারে কিছুটা আত্মসমীক্ষায় নামতে পারেন। পাঠক নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন–

১. আমি কেন লিখতে চাই?

২. আমার মধ্যে লেখার সহজাত ক্ষমতা কিংবা যথেষ্ট অনুপ্রেরণা আছে কি, না এটা সাময়িক হুজুগ?

সঠিক উত্তর লিখে যদি নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারেন তবে আসুন পরবর্তীতে ঃ

৩. আমি কোন্ ধরনের লেখা লিখতে চাই– গল্প, উপন্যাস, কবিতা– না প্রবন্ধ, সমালোচনা, না অন্য কিছু?

৪. যে ধরনের লেখা আমি লিখতে চাই, এর জন্য আমি কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারি?

৫. লিখতে হলে কি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কি কোনও বিকল্প আছে? কী করে আমি আমার অভিজ্ঞতাকে লেখায় ব্যবহার করতে পারি?

পর্ব ২

লেখার সন্ধানে

বিষয়বস্তু

আমাদের চারদিকের দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য জগতে ছড়িয়ে রয়েছে কত কী! আমাদের রয়েছে সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়, রয়েছে মন, যাকে ভারতীয় দর্শনে বলা হয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আমাদের প্রভাবিত করে, জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা আমাদের ছুঁয়ে যায়।

আমরা নিজের মধ্যেই লেখার বিষয়বস্তু খুঁজে পেতে পারি। আর চারদিকে দৃশ্যমান জগতের দরজা তো খোলা রয়েছেই। জীবনের দিকে চোখ কান খোলা রাখলে লেখার বিষয়ের জন্য চুল ছিঁড়তে হয় না– বিষয়বস্তুই অর্থাৎ থিমই এসে ভিড় করবে লেখকের মনে। তখন লেখককে ভেবে নিতে হবে কোনটাকে অগ্রাধিকার দেবেন, আর কোনটাকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখবেন। মনের দরজায় ভিড় করা চিন্তা বা ভাবনাকে একটি ডায়েরিতে নোট করে রাখাটা খুবই লাভজনক হয়। দীর্ঘদিন ডায়রিতে বন্ধ থাকলে এ থেকে অনাবশ্যক অংশ ঝরে পড়ে এবং যাকে বলা যেতে পারে একেবারে নির্ভেজাল বিষয়বস্তু, তা আরো প্রকটভাবে নিজেকে জাহির করে।

একটি কথা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে, বিষয়বস্তু হাতড়াতে হাতড়াতেই বেলা যদি ফুরিয়ে যায়, তবে লেখা আর শুরু হবে না। লিখতে লিখতেই বিষয়ের গভীরে

যেতে হবে, চিন্তাকে বিস্তৃত করতে হবে। অভিজ্ঞতা পুরোপুরি সঞ্চয় করে লিখব বলে বসে থাকলে হবে না, লিখতে লিখতেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে।

পথে না নামলে তো আর পথ চেনা যায় না– আবার পথ সম্বন্ধে একেবারে কোন ধারণাই না থাকলে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। তাই দুদিকেই দৃষ্টি রাখা চাই।

আঙ্গিক

বিষয়বস্তুর পরই যে দিকে লেখককে মনোযোগ দিতে হয়, তা হল রচনার আঙ্গিক। সাধারণতঃ বিষয়বস্তুই রচনা কী ফর্মে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়। কোন্ বিষয়টি ছোটগল্পের প্লট হবে, কোন্‌টি হবে উপন্যাস, আবার কোন্‌টি হবে কবিতা বা প্রবন্ধ– বিষয়বস্তুই অলক্ষ্যে ঠিক করে দেয়। তবে অনেক সময় লেখক সমস্যায়ও পড়েন কোন্ আঙ্গিকে লিখবেন, তা নিয়ে। সঠিক আঙ্গিক নির্বাচনটা লেখা সার্থক হবার প্রাথমিক শর্ত।

'হাইড্র্যান্ট খুলে কুষ্ঠরোগীর' জল খাওয়ার দৃশ্য থেকে একটি সার্থক ছোটগল্পের প্লট উঠে আসবে, কিন্তু উপন্যাস বা বড়গল্প যে হবে না– এ সত্যটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্য কোন ব্যাকরণ নেই– লেখককে নিজেই বুঝে নিতে হবে তা। আবার, শরতের আকাশে পেঁজো তুলোর মত মেঘ, কাশবন, সাদাডানা-বকের উড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে যদি প্রবন্ধ না লিখে কবিতা লিখব বলে মনস্থ করেন, তবে তা যথার্থ সিদ্ধান্তই হবে।

এতকিছু বলার পরও এ কথাটি বলতে হবে, কোন্‌টা কোন্ আঙ্গিকে রচিত হবে, এর কোন বাঁধা ধরা নিয়ম কখনওই হতে পারে না। এর উদাহরণ রবীন্দ্রসাহিত্যে রয়েছে প্রচুর। কবিগুরু উপন্যাসের কাহিনীকে মঞ্চনাটকে রূপান্তরিত করেছেন, 'গীতবিতানে'র পঙক্তিগুলোকে নেড়েচেড়ে গান থেকে কবিতা বানিয়ে নিয়েছেন, আবার কবিতা থেকে গানও বানিয়েছেন প্রচুর।

আঙ্গিক নির্ধারণের পরই যে প্রশ্নটি প্রধান বিবেচ্য, তা হল রচনার পরিসর।

পরিসর

ঠিক কতটুকু লিখব, কতদূর পর্যন্ত রচনার ব্যাপ্তি ছড়াব, ঠিক কোথায় পৌঁছে গুটিয়ে নেব– এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রচনাটির পরিসর নির্ধারণ করতে হবে খুবই সচেতনভাবে। প্রতিটি অংশই যেন মূল বিষয়ের সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে নিবিড়ভাবে গ্রন্থিত থাকে; কোনও অংশই যেন অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য মনে হয় না, এটা ভেবে দেখতে হবে। তবে এর বিপরীতটিও যেন না ঘটে– যতটুকু বলার তা বলতেই হবে। পরিমিতি বোধ যেন কখনই কৃপণতায় পর্যবসিত না হয়।

স্টাইল

লেখকের নিজস্বতাই হ'ল তাঁর স্টাইল। প্রতিটি ব্যক্তির প্রকাশভঙ্গি, উচ্চারণ, শব্দচয়ন, চিন্তাকে পরপর বিন্যাস করার ধরন স্বতন্ত্র। অবশ্যই যদি তা মৌলিক হয়। অনুকরণ করে কোন স্টাইল রপ্ত করা যায় না।

একটি রচনা অলঙ্কারপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তা পাঠককে তৃপ্ত করবে, এমন কোন কথা নেই। আবার একেবারে সাদামাটা, অলঙ্কার বর্জিত রচনাও পাঠককে আবিষ্ট করে তুলতে পারে। বাংলা সাহিত্যে 'গীতাঞ্জলি'র মত সহজ, সরল, স্বচ্ছ, কাব্যগ্রন্থ আরেকটি খুঁজে পাওয়া যাবে কি? কিন্তু এ ছোট্ট কবিতার বইটিকে আজও আমরা পড়ে শেষ করতে পেরেছি কি? লেখককে সচেতন থাকতে হবে, সৌন্দর্যসৃষ্টি করতে গিয়ে রচনা যেন কৃত্রিম হয়ে না পড়ে, আবার স্পষ্ট, সহজ, সাবলীল হতে গিয়ে যেন রচনা একেবারে ম্যাড়মেড়ে, দুর্বল না হয়ে যায়।

'সিমপ্লিসিটি ইজ দ্য বেস্ট স্টাইল' কথাটি সবসময় মনে রাখতে হবে এবং এ সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে 'সিমপ্লিসিটি'র অর্থ 'পভার্টি' নয়। রচনা স্বচ্ছ হবে, স্পষ্ট হবে, সুন্দর সাবলীল হবে, কিন্তু দুর্বল যেন না হয়।

স্টাইল আসলে কী, তা এক কথায় বলা শক্ত। কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যের গুণে আমরা হাজারটা কবিতার মধ্যে শঙ্খ ঘোষের পঙক্তিকে সহজেই সনাক্ত করতে পারি, সূচিপত্র বা শিরোনাম না দেখেই শক্তিপদ ব্রহ্মচারীকে চিনতে পারি, মলাট না দেখেই বলতে পারি কোনটা আবুল বাশারের আর কোনটা সুবিমল মিশ্রের গল্প, অথবা কোন্ নিবন্ধের লেখক সুজিৎ চৌধুরী আর কোন্টা লিখেছেন তপোধীর ভট্টাচার্য– এ বৈশিষ্ট্যই হল লেখকদের স্টাইল। এ স্টাইল একটি দু'টি রচনাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে, আবার শতশত রচনাতেও না হতে পারে।

লেখার জন্য পড়া এবং . . .

পড়া, কেন

একজন লেখকের প্রাথমিক কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম কাজই হল পড়া। মাতৃভাষার এবং প্রতিবেশী সাহিত্যের যে ভাষার সঙ্গে মোটামুটি অল্পবিস্তর পরিচয় আছে সেই ভাষার নির্বাচিত এবং প্রতিনিধিমূলক সমস্ত রচনাই নিয়ম করে পড়ে নিতে হবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার জন্য। মাতৃভাষায় এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত বিদেশি সাহিত্যের রচনাকৃতিও Text হিসেবে পড়ে নেওয়া প্রয়োজন লেখালেখির জন্য।

নিছক সময় কাটানোর পড়া, আর লেখক হিসেবে নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার পড়া কিন্তু এক নয়। আর, সাহিত্য পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভের পড়ার পদ্ধতির সঙ্গে এ পড়ার ধরনকে মিলিয়ে দিলেও চলবে না। লেখার টেক্‌নিক রপ্ত করার লক্ষ্যকে সামনে

রেখেই পড়া চালিয়ে যেতে হবে, পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য নয়, বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও নয়। রচনার ভাষা, শব্দ প্রয়োগ, আঙ্গিক, পরিসর, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যেই পড়ে যেতে হবে। আর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ঘাটতি পূরণের জন্য পড়াশুনার কথা তো ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়ে গেছে।

অপেক্ষা

তাড়াহুড়ো করে আর যাই হোক্ না কেন লেখা যায় না। কিংবা, তাড়াহুড়ো করে কিছু একটা লিখে নিলেই যে তা প্রকৃতপক্ষে 'লেখা' হয়ে উঠবে, এমন কথাও নেই। তাই লেখার জন্য একটি ভাবনাকে মনের ভেতর ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে নিজস্ব নিয়মেই এগিয়ে যেতে দিতে হবে। এ প্রক্রিয়াটি অতি অবশ্যই কোন ক্যালেন্ডারের বা ঘড়ির শাসন মেনে চলে না– লেখা ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়ে নিজেই একসময় প্রকাশ লাভ করে। এই প্রক্রিয়াটি সচল রাখাটা অবশ্যই লেখকের কর্তব্য, কিন্তু জোর করে লিখে ফেললে লেখাটা নষ্ট হয়ে যাবে কারণ সমস্ত প্রচেষ্টা, প্রস্তুতি এবং সচেতন প্রয়াসের পরও একটি রচনা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ– এবং এ প্রকাশকে সম্ভব করতে হলে 'সময়' কে তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে দিতেই হবে।

কয়েকটি আবশ্যক পদক্ষেপ

লেখার জন্য প্রতিনিয়ত নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা-অভিজ্ঞতার নোট রাখাটা একান্ত জরুরি। এতেই রচনার বিষয়বস্তু নিজস্ব ফর্ম পেয়ে যায়, স্বল্প আয়াসেই প্রয়োজনীয় তথ্য সঞ্চিত হয়ে যায়, এবং মনের সৃজনশীলতা লাভ করে গতি।

লেখার বিষয়বস্তু ঠিক হয়ে গেলে, আঙ্গিক নির্ধারিত হয়ে গেলে এবারে প্রস্তুতি পর্বের পরবর্তী জরুরি কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে– (গল্প, উপন্যাসের ক্ষেত্রে)

- প্লট-পরিকল্পনা। প্লটটি কীভাবে নির্মাণ করবেন, বিবরণটি কীভাবে দেওয়া হবে– প্রথম পুরুষে, না চরিত্রের মুখ দিয়েই, না অন্য পদ্ধতিতে (Omnicient, omnipresent বা all-knowing view point থেকে)– এসব খুঁটিনাটি বিষয়ের নোট নেওয়া;
- চরিত্র এবং ঘটনাগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে সাজিয়ে নেওয়া– এদের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা;
- বর্ণনার ভাষা, সংলাপের ভাষা প্রয়োগের সুস্পষ্ট নীতি ঠিক করে নেওয়া;
- কাহিনীটি কীভাবে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে এর পরিকল্পনা করা।

অবশ্য লিখতে বসলে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক পথেই লেখাটি এগিয়ে যাবে তা কোনও মতেই আশা করা যায় না। সৃজনশীল রচনা যে এরকম পরিকল্পিত কাঠামো অনুযায়ী এগিয়ে যাবে, এটা আশা করা কখনই উচিত হবে না। লিখতে বসলে হয়তো বা একেবারে ভিন্নপথেই এগোতে থাকবে রচনাটি– লেখকের পূর্বপরিকল্পনা একেবারে বাতিল করেই– এরকম সম্ভাবনাও একেবারে অসম্ভব নয়। তবে (non-fictional prose) অর্থাৎ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচনা কিংবা গবেষণামূলক, অ্যাকাডেমিক রচনায় পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনায় এগোনো অনেক বেশি সহজ এবং সম্ভবও,– এবং এর ফলে লেখার সৃজনশীলতা বিশেষ ক্ষুণ্ণও হয় না।

আরও কয়েকটি পদক্ষেপ

- স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট ভাষা প্রয়োগের প্রতি যত্নশীল হওয়া। চিন্তা এবং এর প্রকাশ যেন সব সময়ই সহজ এবং পরিষ্কার হয়, এদিকে সচেষ্ট থাকা;
- শব্দের সঠিক প্রয়োগের জন্য অভিধান, প্রতিশব্দের বই (Thesaurus), ব্যাকরণ হাতের কাছে রাখা, এবং বার বার দেখে নেওয়ার অভ্যাসটি তৈরি করা;
- প্রাচীন শব্দ, প্রকাশরীতি এবং বাক্য বর্জন করা। ইংরেজিতে যাকে বলে archaism তা পরিত্যাগ করা, অপ্রয়োজনীয় স্ল্যাং এবং ক্লিশের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা; অতিকথন পরিহার করা।
- লেখাটিকে অন্তরঙ্গ, স্বাভাবিক এবং সতেজ রাখার প্রতি যত্নশীল হওয়া। তাছাড়া, লেখক নিজেকে পাঠকের আসনে বসিয়ে নিজের রচনাটির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে খুবই সার্থক হয় রচনাটি। নিজের রচনার প্রথম সমালোচকের কাজটি নিজেই করে নিতে হবে, এর পর অন্যের মতামত খুব গুরুত্ব দিয়েই শুনতে হবে; অবশ্য গ্রহণ, বর্জনের কাজটি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী করাই উচিত। এবং– এমনি করেই লেখক তার রচনাকর্মটি যথাযথভাবে শেষ করে উঠতে পারবেন।

বই পড়া, বই দেখা

কিছু কিছু লোক আছেন যারা খবর-কাগজের বাইরে কিছুই পড়েন না। আরেক দল আছেন যারা ম্যাগাজিন পর্যন্ত অগ্রসর হ'ন। আবার আরেক দল আছেন যারা সাধারণ গল্পের বই, উপন্যাস পর্যন্ত এগিয়ে যান– বই পড়া এদের কাছে 'গল্প-বই পড়া'রই (Story-book reading) নামান্তর। পাঠক হিসেবে এ দলের প্রত্যেকেরই একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে; এটা অবশ্য কোন দোষের নয়। কিন্তু যিনি পাঠক, আবার কেবল-পাঠকই নন, লেখকও, তিনি যদি এ দলভুক্ত হ'ন তবে চলবে না। খবর কাগজের খেলার পাতাটি যেমন তাঁকে দেখতে হবে, তেমনি সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলোও তাঁকে পড়তে হবে; গল্প-কাহিনী, উপন্যাস যেমন পড়তে হবে, তেমনি সমালোচনা গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ

কবিতা– সবকিছুই তাঁকে পড়তে হবে গভীর মনোযোগ দিয়ে। এবং তাঁকে সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, তাঁর সমস্ত পড়াই শুধু 'তোমারে লক্ষ্য করে'। অর্থাৎ, লেখার জন্যই পড়া–। এটাই তার প্রধান লক্ষ্য।

একজন সচেতন পাঠকের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের তফাৎ বিস্তর। সাধারণ উপন্যাসের পাঠক যেখানে কাহিনীর সূত্রটি ধরে আমেজের সঙ্গে পৃষ্ঠা থেকে পৃষ্ঠান্তরে যাবেন, সচেতন পাঠক সেখানে তাড়িত হবেন তিনটি প্রশ্নে– কী লিখেছে, কেন লিখেছে, আর কীভাবে লিখেছে। তিনি শুধু বিষয়-সন্ধানী নন, সন্ধানী লেখকের চিন্তার পারম্পর্যের, কলানৈপুণ্যের এবং ভাষা প্রয়োগের পদ্ধতিরও। তাঁর পাঠ নিছক গ্রহণ নয়, অর্জন। বেতার যন্ত্রের রিসিভারের মতো তিনি প্রচারিত অনুষ্ঠানের শুধু গ্রহীতাই (receiver) নন্, তাঁর কাজ আরো ব্যাপক।

বই বা পত্র-পত্রিকা 'পড়া' কর্মটির সঙ্গে 'দেখা'র কাজটিও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। অনেকেই বই পড়েন, কিন্তু 'বই দেখেন' কেউ কেউ। যাঁরা লিখবেন, তাঁদের কিন্তু সেই 'অনেকের দলে' ভিড়লে চলবে না। বই দেখার কাজটিও তাঁদের শিখে নিতে হবে।

এই 'দেখা'র মধ্যে রয়েছে বইয়ের আঙ্গিক (Format), মলাট, প্রচ্ছদ, লেখকের নাম, বইয়ের শিরোনাম (title) মুদ্রণের পদ্ধতি, কোন পৃষ্ঠায় কী কী তথ্য কীভাবে থাকবে– এসমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় জেনে নেওয়া। আমরা অনেকেই বই পড়ে ফেলি, কিন্তু লক্ষই করি না এর প্রচ্ছদটি কে করেছেন, প্রচ্ছদের তাৎপর্য্যটি কী। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা যে মুদ্রণ শিল্পের একটি বিশেষ অঙ্গ এসব চিন্তাই আমাদের মনের মধ্যে জাগে না। আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখি না ঠিক কোন্ পৃষ্ঠার কোন্ দিকে মুদ্রক, প্রকাশক, পরিবেশক, প্রচ্ছদশিল্পী, কপিরাইট, প্রকাশনার স্থান-কাল ইত্যাদি অতিপ্রয়োজনীয় তথ্য ছাপা হয়। এ পৃষ্ঠাটি আপাত দৃষ্টিতে মামুলি, কিন্তু লিখতে বসলেই দেখবেন যথেষ্ট পরিশ্রম, চিন্তা এবং দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে এটা তৈরি করতে।

অনেক সময়ই আমরা দেখি বইটিতে প্রকাশনার সন তারিখ নেই, কিংবা পরিবেশকের ঠিকানাটি নেই। বইটি প্রথম প্রকাশ, না পুনর্মুদ্রণ, বইটি কি সম্পাদিত না সংকলিত– এসব তথ্য অস্পষ্ট অথবা নেই।

লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্পাদনার ক্ষেত্রেও এসব দিকে সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। এমনকি বিভিন্ন সংস্থার মুখপত্র, স্মরণিকার সম্পাদকদেরও এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন।

এরপর যে দিকটি সাধারণ পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় তা হ'ল, অক্ষরের আকার এবং বিন্যাস। এরকম বই, পত্রপত্রিকা আমাদের চোখে পড়ে প্রায়ই যেখানে দেখা যায় বিশাল আকারের অক্ষরে লেখকের নাম ছাপা হয়েছে কিন্তু বই বা পত্রিকা, কিংবা রচনাটির শিরোনাম একেবারে ছোট অক্ষরে। কিংবা, বিশাল অক্ষরের শিরোনামের নীচে ছোট্ট অক্ষরে লেখকের নাম। দুটোর মধ্যে সমতা নেই।

তাছাড়াও, কোথায়, কী ধরনের রচনায়, কোন পৃষ্ঠায় রচনার (article) শিরোনাম

আগে আর লেখকের নাম পরে, বা লেখক আগে, শিরোনাম পরে– এটাও সাধারণ পাঠকের সচরাচর লক্ষ করা হয়ে ওঠে না; কিন্তু যিনি নিজে লেখক, তাঁকে এসব খুঁটিনাটি সবকিছুই জেনে নিতে হবে। প্রতিটি অক্ষরের (letters) নিজস্ব পরিচয় রয়েছে। 9 point, 12 point, 9 point bold, 12 point, Italic ইত্যাদি, এবং ক্ষেত্র বিশেষে অক্ষরের নিজস্ব ভাষা (Print Language) রয়েছে।

সচেতনভাবে, অর্থাৎ Critically ভালো প্রকাশনীর, সুমুদ্রিত, সুসম্পাদিত বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি বই 'দেখে' নিলেই এ বিষয়টি শিখে নেওয়া যায়। তবে মুদ্রণপ্রযুক্তির (Printing technology) বিশেষ পাঠক্রমও রয়েছে, রয়েছে এ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বইপত্রও। লেখালেখির জগতের লোকের এ বিষয়ে মোটামুটি একটু স্পষ্ট ধারণা থাকাটা প্রয়োজন।

মফঃস্বলে বা প্রান্তিক অঞ্চল থেকে (বরাক উপত্যকা থেকেও) প্রকাশিত, মুদ্রিত বই, পত্র পত্রিকার যে বিষয়টি আমাদের সচরাচর পীড়িত করে তা হ'ল লেখক, সম্পাদক বা মুদ্রকরা মুদ্রণ প্রযুক্তির নিয়ম-রীতির প্রতি যত্নশীল নন্। কোন্ পাতায় 'পৃষ্ঠা সংখ্যা' (Page mark) বসবে, কোন্‌টি শূন্য থাকবে (non-paged) এ ব্যাপারেও এরা মোটেই সচেতন নন।

লেখক পরিচিতি, তা বইয়ের পেছনের মলাটেই (blurb) হোক্ বা একটি বিশেষ পৃষ্ঠাতে, কিংবা প্রতিটি title page এর নীচে ফুটনোট দিয়েই হোক্– এখানেও যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। কতটুকু বলব, কী বলব এবং কেন বলব তা ভেবেচিন্তেই লিখতে হবে। এক-একজন লেখকের জন্য এক এক ধরনের পরিচিতি-লিখন কখনই কাম্য নয়। একজনের জন্মস্থান, জন্মসন তারিখ, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রকাশিত বইপত্রের নাম, পুরস্কার প্রাপ্তির বিবরণের পাশেই যদি আরেকজন লেখক সম্বন্ধে মামুলি কয়েকটি কথা– 'বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে',– 'একাধিক কবিতার বইয়ের লেখক তিনি'– এসব যদি লেখা হয় (প্রায়শই তা হয়), তবে তা সমস্ত বইটিকে একেবারে লঘু করে দেয়। পাঠকরা মলাটলিখনে বা পরিচিতিতে লেখকদের জীবনী জানতে চান না, জানতে চান এদের সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি তথ্য এবং বর্তমান রচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তথ্যই। কোন প্রশস্তি বাক্য, বা সমালোচনা কিংবা উৎসাহ-বাক্য নয়।

বই 'দেখতে' হবে শুধু বইয়ের বহিরঙ্গ খুঁটিনাটি বিষয় জানার জন্যই নয়, লেখা-কর্মটিরও যে কিছু কিছু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে এবং যে দিকে যথেষ্ট মনোযোগী না হ'লে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসলেই পদে পদে আটকে যেতে হয়– এ সমস্যাকেও অতিক্রম করার জন্য।

অনেক চেষ্টা চরিত্র করে, সময় সুযোগ মতো কাউকে আমরা চট্ করে কথাটি বলে ফেলতে পারি– 'তোমাকে কথাটি বলব ব'লে ভাবছি অনেক দিন'– কিন্তু লিখতে গেলেই সমস্যা– 'বলে' না 'ব'লে– কী লিখব? উর্দ্ধকমা না দিলে যে 'বলে' আর 'ফুটবলে' এক হয়ে যায়।

আমরা কমা, দাঁড়ি, সেমিকোলন, ড্যাস, হাইফেন, প্রশ্নবোধক, কোলন, উদ্ধৃতিচিহ্ন– এসব ব্যবহার করলেও, এদিকে আমরা খুব যত্নশীল নই। এসবের যে নিজস্ব ভাষা রয়েছে, এরা যে লেখার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আমরা তা ভাবি না। ফলতঃ মুদ্রিত রচনা, গল্প, কবিতা সচরাচরই থাকে ভুলে ভরা। দোষ দিই ছাপাখানার 'ভূতকে', আসলে ভুলটা লেখকের নিজেরই।

লেখকরা যথাযথভাবে চিহ্নের প্রয়োগ করেন না, 'প্রেস-কপি' নিজে তৈরি করে দেন্ না। এ অবস্থায় কম্পোজার এবং প্রুফ রিডার নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী রচনাটিকে মেশিনে পাঠান।

শুধুমাত্র লিখে নেওয়াটাই লেখকের কাজ নয়। লেখাটি সঠিকভাবে মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসার দায়িত্বও লেখকের। কারণ প্রকাশিত রচনাটি পাঠকের কাছে সর্বক্ষণই লেখকের রচনা হিসেবেই গণ্য হবে, প্রকাশকের নয়, মুদ্রকের তো নয়ই। তাই বলছিলাম লেখালেখির জগতে প্রবেশ করতে হ'লে বই পড়া একই সঙ্গে হয়ে উঠুক্ বই দেখাও।

বানান নিয়ে, ভাষা নিয়ে দু চার কথা

কী বলিতে পাছে কি বলি

আমরা ইংরেজি বানান ভুল করলে লজ্জায় মরে যাই, কিন্তু বাংলা বানানটা যে শুদ্ধ করে লেখার নিয়ম, এটা যেন মান্‌তেই চাই না। 'আজকাল বানানের কোন নিয়ম নেই', 'এরকম বানান কলকাতার পত্র- পত্রিকায়ও দেখা যায়', 'দৈনিক– পত্রিকায়' এরকমই তো লিখছে'– এ ধরনের কথা প্রায়ই শোনা যায়। 'আজকাল বানানের কোন নিয়ম নেই'– কথাটির মধ্যে সত্য এটাই যে, বানানকে কখনোই কোন কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না– চসার থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এলিঅট থেকে গ্রাহাম গ্রিন পর্যন্ত ইংরেজি বানান যে একই নিয়মে চলছে তা তো নয়, রামমোহন-ঈশ্বরচন্দ্র-বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত কিংবা বুদ্ধদেব থেকে পবিত্র সরকার, শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত বাংলা বানান যে একই ধারায় চলছে তা কেউ'ই বলবেন না। ১৯৩৬ সালে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম' যথেষ্ট মনে না হওয়া ১৯৮৮তে 'বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তনে নতুন উদ্যোগ নেন; এরপর ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আবার এ কর্মে ব্রতী হ'ন। এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অদ্যাবধি বাংলা বানানকে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে আনা যায়নি; বোধহয় তা সম্ভবও নয়, বিশেষ করে বর্তমানে মুদ্রণ-প্রযুক্তির পরিবর্তনে বাংলা অক্ষরবিন্যাস এবং বানান নতুন রূপ নিতেই পারে। কিন্তু, এত সব কথার অর্থ এ নয় যে আমরা বানানের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছে তা'ই করব।

সাম্প্রতিক কালে বাংলা পত্র-পত্রিকায়, বিজ্ঞাপনে, দূরদর্শনের পর্দায় যে বানান বিভ্রাট ঘটে চলেছে, (বরাক উপত্যকা এক্ষেত্রে আরো অগ্রণী) এ পরিস্থিতিতে লেখকদের

বানান সম্বন্ধে আরো বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন, নইলে লেখার জগতে চরম বিশৃঙ্খলতা দেখা দেবে। এপার বাংলা এবং ওপার বাংলায় প্রচুর অভিধান বেরিয়েছে, বেরিয়েছে ব্যবহারিক শব্দকোষ আঞ্চলিক অভিধান, প্রতিশব্দের অভিধান। তাছাড়াও শব্দতত্ত্ব, শব্দের প্রয়োগ বিষয়ক বইপত্র রয়েছে– এগুলোর সন্ধান করা এবং ব্যবহার অভ্যাস করা লেখকদের খুবই প্রয়োজন।

বানানের শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, বর্তমান আলোচনার প্রতিপাদ্যও তা নয়– আমি শুধু একথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই যে শুদ্ধ বানানটি শুধু জানা থাকলেই যথেষ্ট নয়, হাতের লেখায় তা রপ্ত করে নেওয়া চাই। সহজ, সর্বজনগ্রাহ্য আধুনিক বানানের নিয়মকানুন জানা থাকলেও আমরা অভ্যাসবশত 'ভট্টাচার্যে'র য-ফলা রেখে দিই, 'সর্ব'র দ্বিত্ব বর্জিত হলেও 'সর্ব্ব' লিখে বসি, 'কর্তা'র স্থলে 'কর্ত্তা' না লিখে যেন স্বস্তি পাই না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বয়ং এ প্রবণতা থেকে রেহাই পাননি। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন–

> "এখন থেকে 'কার্ত্তিক', 'কর্ত্তা' প্রভৃতি দুই-ত ওয়ালা শব্দ থেকে এক 'ত' আমরা নিশ্চিত মনে ছেদন করতে পারি... হাতে লেখার অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না। কিন্তু ছাপার অক্ষরে পারব।"
> (দেবীপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত, বাংলা বানান : বিতর্ক ও সমাধান, সম্পাদক: সমীর সেনগুপ্ত, সমীর বসু, কলিকাতা'-৩৮)

এ-অভ্যাস আমাদের ছাড়তে হবে ছাপার অক্ষরে তো বটেই, হাতের লেখায়ও। নইলে যে সমস্যাটি আমরা তৈরি করি, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তা করেননি– রবীন্দ্র রচনাবলীতে একই শব্দের এক-এক রকম বানান দেখা যায়নি। কবিগুরুর যে ক'টি পাণ্ডুলিপিও সাধারণ্যে প্রকাশিত, এতেও দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এ বিভ্রমটি দেখা যায় না।

বরাক উপত্যকায় বাংলা বানানের বিপুল বিভ্রমের একটি প্রধান কারণ হ'ল এখানে শুদ্ধভাবে বাংলা উচ্চারণের অক্ষমতা। বানান শুদ্ধ করতে হলে শব্দগুলো শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা চাই এবং এজন্য কোন ভাষাতাত্ত্বিক হবার প্রয়োজন নেই, কানটাকে একটু সচেতন করে নিলেই হয়। শুধু উচ্চারণের দোষেই আমাদের লেখায় বিরাট সব ভ্রান্তি হয়ে চলেছে অবিরত। আমরা কি একটুও খেয়াল করি যে, আমরা 'কী' শব্দটির যথাযথ প্রয়োগ প্রায়শই করতে পারি না। 'কী বলিতে পাছে কি বলি' এ আশঙ্কাই আমাদের পীড়িত করে না।

লিখতে বসে বার বার অভিধান ঘাঁটা 'কী যে মিহি কেরানীর কাজ' তা লেখকমাত্রেই জানেন। এ শ্রম দূর করার একটি আনন্দময় পন্থা লেখকদের দেখিয়ে দিই। মনে করুন লিখতে বসে সমস্যা হ'ল 'নিবিড়' লিখব না 'নিবীড়', 'নিশীথিনী' না 'নিশিথিনী', 'নীরবে' না 'নিরবে', 'ভৎসনা' না 'ভর্ৎসনা', 'ঊষা' না 'উষা', 'মন্দাকিনী' না 'মন্দাকীনি'? বহুশ্রুত গানের কলিগুলি মনে মনে ভাঁজতে ভাঁজতে কিম্বা মৃদুস্বরে গাইতে গাইতেই ওল্টাতে থাকুন 'গীতবিতানে'র পাতাগুলি– 'নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী-সম', 'তুমি রবে

নীরবে' (পৃ: ২৯৭)' .... 'তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে– সুরভুলে যেই ঘুরে বেড়াই' (পৃ : ১৫), 'মন্দাকিনীর ধারা, উষার শুকতারা' (পৃঃ ১)– সুরের গুরু এসে ঠিক দিয়ে যাবেন দীক্ষা। ক্লান্তি দূর হবে, সঠিক বানানটিও এসে যাবে কলমের ডগায়। লেখার টেবিলে একটি অখণ্ড 'গীতবিতান' রেখে দিন। দেখবেন অভিধানের বিকল্প হিসেবে এ বইটিও ব্যবহার করা যায়।

চলিতে চলিতে, চলতে চলতে

সাধু ভাষার সৌন্দর্য, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, কাব্যিক গুণ এবং এর একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, এ ভাষা এখন স্কুলের নোট থেকেও বিদায় নিয়েছে। বর্তমানে 'আনন্দবাজারে'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার এক কোণ দখল করে কোন মতে প্রাণটা টিকিয়ে রেখেছে বাংলা গদ্যের এই সাধু রূপটি। কবিতায় এবং গানে আরো অনেক দিন, হয়ত বা অনন্তকালই সাধুভাষা বেঁচে থাকবে, কিন্তু গদ্যে এর প্রয়োগ ক্রমে'ই শেষ হয়ে আসছে।

নতুন লেখককে চলতি ভাষায় লেখাটা রপ্ত করতে হবে খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে, কারণ চলতি ভাষা মানে চটুল-ভাষা নয়। কঠিন, গুরুগম্ভীর, তাত্ত্বিক নিবন্ধ কিছুদিন আগেও সাধু ভাষায় লেখা হয়েছে, এখন সে যুগ গত। নতুন লেখককে সাধু-চলতির মিশ্রণে গুরুচণ্ডালি দোষের সম্ভাবনাকে দূর করতেও যত্নশীল হতে হবে। শুধু 'করিয়া'কে ক'রে, বলিয়া'কে ব'লে আর 'চলিতে'কে চল'তে করলেই সাধুভাষাটির চলতি-তে রূপান্তর হয় না– এর সঙ্গে শব্দ ব্যবহার, বাক্যগঠন এবং লেখার টোনও রয়েছে। বরাক উপত্যকার লেখকদের পক্ষে কাজটি একটু সহজ, কারণ এখানকার কথ্য উপভাষাটি অত্যাশ্চর্যজনকভাবে বাংলা সাধুভাষার বেশ কাছাকাছি। করিয়া-দেখিয়া কান্দিয়া-ফিরিয়া বরাকবাসী নিজেদের অজান্তেই একেবারে শিষ্ট বাংলা ভাষাভাষী– এটা এঁদের বোঝাবার ভার অবশ্য সুজিৎ চৌধুরী, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নিয়েছেন।

নতুন লেখকদের শব্দ-চয়ন, শব্দ-সৃজন এবং শব্দ-প্রয়োগ– এ তিনটি কাজই রপ্ত করতে হবে লেখায় প্রাণ সঞ্চারের জন্য। বাংলা ভাষার লেখকদের এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, বাংলা ভাষাটি মধ্যযুগীয় অবিভক্ত বঙ্গ (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে) এবং পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসামের নওগাঁ-ধুবড়ি, বরাক উপত্যকা এবং ত্রিপুরা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত একটি বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ডের জনগণের মাতৃভাষা। কয়েক'শ বছরের বিবর্তনে এ ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য একটি সাধু রূপ গড়ে উঠেছে; শতাব্দী প্রাচীন এর চলতি ভাষায় রচনা-সৃষ্টির ইতিহাসও; তাছাড়াও রয়েছে এ ভাষার আঞ্চলিক এবং দেশজ রূপ, যা প্রতিনিয়তই বাংলাভাষাকে জুগিয়ে আসছে এর প্রাণরস। একটি 'জীবিত ভাষা' (living language) সত্যই পরিবর্তনশীল (সঞ্চরণশীল)। এ অবস্থায় এ ভাষায় রচনাকে জীবন্ত করে তুলতে হলে লাইব্রেরির চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে হাটে মাঠে ঘাটে, প্রকাশ্য রাজপথে; খুঁজে নিতে হবে 'মানুষে'র ভাষা, 'কেতাবি' ভাষার সঙ্গে যার পার্থক্য দুস্তর–।

এবারে শুরু হোক্ পাঠকদের কাজ– নিজেদের সঙ্গে নিজেদের সংলাপ এবং পরবর্তী স্তরে যাবার প্রাথমিক প্রস্তুতি ঃ

১. পাঠক আর সচেতন পাঠকের মধ্যে তফাৎ কী?

২. সাধারণ পাঠক কেন বইপত্র পড়েন? একজন নবীন লেখকের পাঠের পদ্ধতি কী হওয়া উচিত?

৩. বিশ্বভারতী, সাহিত্য অকাদেমি, আনন্দ প্রকাশনী এবং বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের একটি করে বই নিয়ে প্রচ্ছদ থেকে সূচিপত্র– সবকটি পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ুন। এখন নোট করুন–

- কোন পাতায় পৃষ্ঠা সংখ্যা আছে, কোনটিতে নেই–? সবক'টি বইতে কি একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে?
- প্রকাশনা সংক্রান্ত পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ডিক্লারেশন পেজ বা লিগ্যাল পেজে প্রকাশিত বই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য কি আছে? দেখুন তো, সবক'টি বইয়ের রচনাকাল, প্রকাশকাল আছে? ডাকযোগে পেতে হলে এখানে পরিবেশকের নির্ভরযোগ্য ঠিকানা কি আছে?
- বইগুলোর ইংরেজি sub-title কি আছে?
- প্রকাশনার সন বঙ্গাব্দ না খ্রিস্টীয়, না উভয়ই? এখন আপনি নিজেই একটি (ডিক্লারেশন পেজ)/ কাল্পনিক বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার নমুনা তৈরি করুন।

৪. একটি উন্নতমানের সংকলন-গ্রন্থ এবং গবেষণাধর্মী পত্রিকা (আকাদেমি পত্রিকা, গবেষণা পরিষদ পত্রিকা, বা বাংলা একাডেমী পত্রিকা) নিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ করুন–

- সূচিপত্র আগে না সম্পাদকীয় আগে বসেছে?
- সূচিপত্রে রচনার শিরোনাম আগে, না লেখকের নাম আগে বসেছে? বই এবং জার্নালে কি একই পদ্ধতিতে পৃষ্ঠাগুলো পরিকল্পিত?
- কোন্ লেখক-পরিচিতিটি আপনার মনে হচ্ছে যথার্থ এবং কেন?

৫. একটি ছাপাখানা থেকে লেটার চার্ট সংগ্রহ করুন এবং মুদ্রণ শিল্পের ভাষায় বিভিন্ন ধরনের অক্ষরগুলোর নাম, আকার এবং ধরন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু অর্জন করে নিন।

- ছাপাখানা থেকেই বই বা ম্যাগাজিনের সাইজ, ফর্মা, সম্বন্ধেও একটা প্রাথমিক ধারণা করে রাখুন। ১/৪ ডিমাই, ১/৮ ডিমাই, ডবল ক্রাউন, মিনি সাইজ, হাফ সাইজ– এরকম কত ধরনের বই, পত্রপত্রিকা হতে পারে– এবং সে সঙ্গে কাগজই বা কত ধরনের হতে পারে, তাও জেনে নিন।
- হার্ডবোর্ড, পেপার ব্যাক, বইগুলোর নির্মাণ শৈলীটা দেখুন। দেশীয় বইয়ের সঙ্গে বিদেশি বইয়ের তুলনা করে দেখুন, কোন্টা কত নিখুঁত।

- ছাপাখানা থেকে কয়েকটি ব্যবহৃত প্রুফ শিট্ এনে প্রুফ দেখার প্রাথমিক নিয়মটি জেনে রাখুন। কোনও কোনও অভিধানেও প্রুফ দেখার নিয়মাবলী দেওয়া থাকে, এটা দেখতে পারেন।

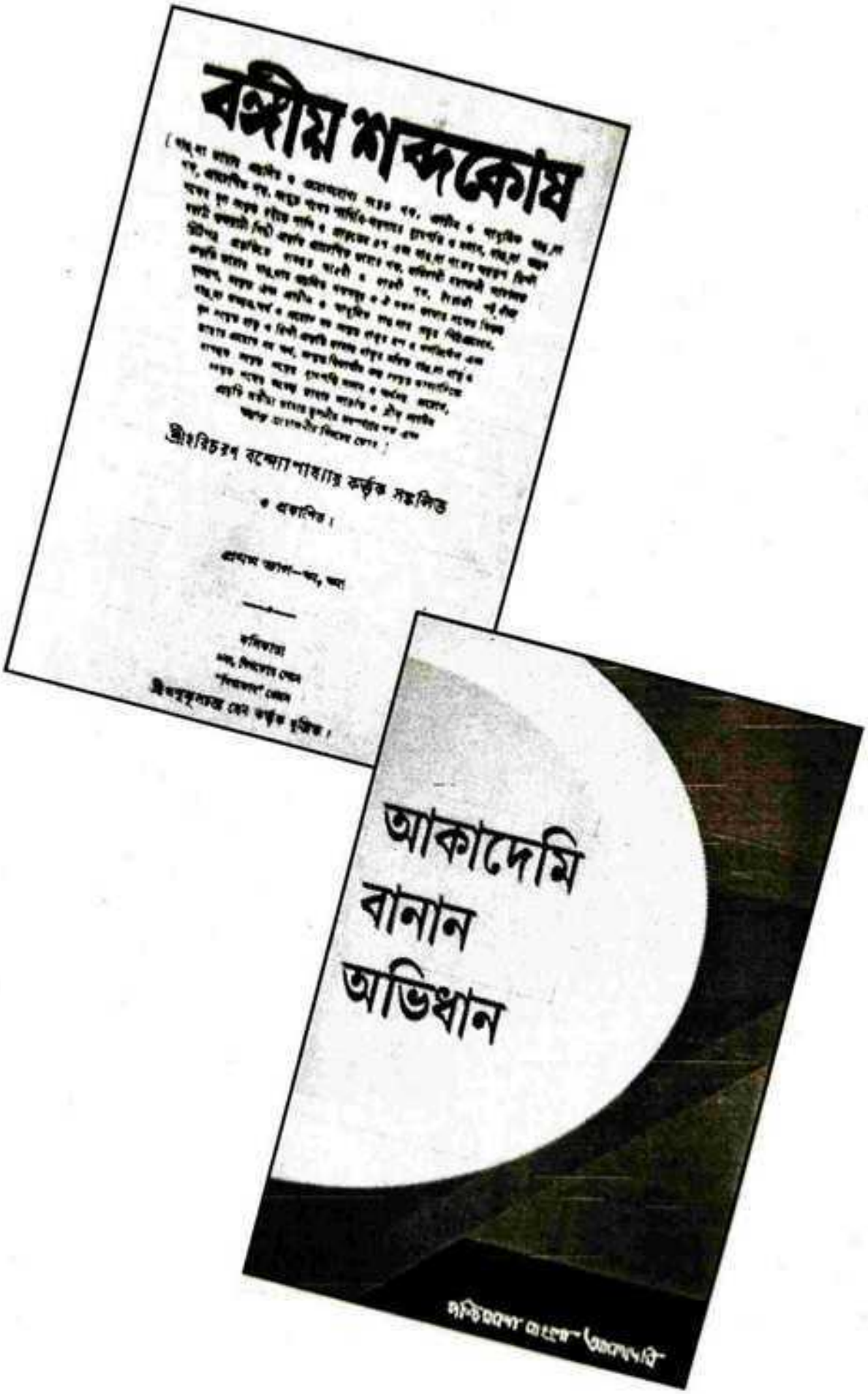
বঙ্গীয় শব্দকোষ
আকাদেমি
বানান
অভিধান

পর্ব ৩

অ্যাকাডেমিক রচনার পদ্ধতি

ইতিমধ্যেই আমরা সৃজনশীল এবং ব্যবহারিক রচনা বিষয়ে আলোচনা করেছি। বিষয়ভিত্তিক গবেষণা-নিবন্ধ, সেমিনার-পেপার, অনুসন্ধান প্রকল্প, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা-প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারি অ্যাকাডেমির প্রাগ্রসর গবেষণা কর্ম– সবকিছুই দ্বিতীয়োক্ত রচনার অন্তর্ভুক্ত। সার্বিকভাবে এসব রচনাকে 'অ্যাকাডেমিক রচনা' হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ রচনাকে গবেষণা-ধর্মী রচনা বলাও চলে, তবে ইদানীং উভয় বাংলাতেই অ্যাকাডেমিক বা একাডেমিক শব্দ দুটোই প্রচলিত হয়ে গেছে। সাহিত্য অকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা– এ শব্দগুলো সুন্দরভাবে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে।*

---

*অ্যাকাডেমি, আকাদেমি, একাডেমী, অকাদেমি বানান নিয়ে সাধারণ্যে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তাই একটু বিস্তারিত আলোচনা করে নেওয়া যাক এখানে। ইংরেজি Akademic শব্দটি এসেছে মূল গ্রিক শব্দ Academia থেকে। চেম্বার্স ডিকশনারিতে মূল শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে, (এথেন্স শহরের বাইরে) 'একটি বাগান', যেখানে সক্রেটিস-শিষ্য প্লেটো তাঁর শিষ্যদের পড়াতেন। সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পর এথেন্সের শাসকগোষ্ঠীর কুদৃষ্টি পড়েছিল তাঁর সুযোগ্য শিষ্য প্লেটোর প্রতি এবং তখন শিষ্য ও শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে তিনি দেশান্তরী হতে বাধ্য হন। বিভিন্ন দেশ ঘুরে অনেক দিন পর প্লেটো আবার তাঁর মাতৃভূমিতে (City state, Athens) আসতে চাইলেও এথেন্স তখনও তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়– এ বিবেচনায় তিনি

অ্যাকাডেমিক রচনা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রাগ্রসর গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যেই আবদ্ধ নেই, বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা, লিট্‌ল ম্যাগাজিনেও আজকাল কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা সাহিত্যের পাশাপাশি খাঁটি অ্যাকাডেমিক রচনাও স্থান করে নিচ্ছে এবং এ ধরনের রচনার পাঠকসংখ্যাও বাড়ছে দ্রুতগতিতে। বর্তমানের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে বিষয়ানুগ গবেষণাধর্মী রচনার পাঠক-বৃদ্ধির কারণ সম্ভবত বাস্তবধর্মী, তথ্যান্বেষী, নিরাবেগ এবং ব্যস্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি। এখন মানুষের জানার চাহিদাটা হয়ে পড়েছে অনেক বেশি সুসংবদ্ধ এবং যথেষ্ট সংকীর্ণভাবেই বিষয়ানুগ। বিচিত্র বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের অঢেল তথ্য-বহুল বিশাল একটি গ্রন্থ না পড়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সঙ্কীর্ণ পরিসরে, সুনির্দিষ্টভাবে অনেক কিছু জানতেই এ যুগের মানুষের আগ্রহ। অর্থাৎ অনেক-বিষয়ের অনেক কিছুর চাইতে অল্প বিষয়ের বা একটি বিষয়ের অনেক কিছুতেই তাঁদের আগ্রহ; এবং এজন্যই অ্যাকাডেমিক রচনার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা।

অ্যাকাডেমিক রচনা বা গবেষণা-ধর্মী নিবন্ধ শুধুমাত্র কিছু তথ্য সন্নিবেশই করে না, তথ্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে একটি সত্যে উপনীত হবার প্রয়াসই এ রচনার অভীষ্ট। এতে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ কর্মে, চিন্তন ও মনন পদ্ধতিতে একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকারও প্রয়োজন এবং এ বৈশিষ্ট্যই একটি সাধারণ নিবন্ধ বা প্রতিবেদনের থেকে একটি অ্যাকাডেমিক রচনাকে আলাদা করে দেয়।

শৃঙ্খলা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা হল অ্যাকাডেমিক রচনার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লেখকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পাঠক একমত নাও হতে পারেন, লেখকের তাত্ত্বিক কাঠামো অর্থাৎ theoretical framework পাঠকের পছন্দানুযায়ী নাও হতে পারে– কিন্তু এতেও রচনার মৌল ক্ষতিবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা নেই। তবে রচনাটি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে

এথেন্সের সীমানার বাইরে একটি বাগানে কুটির বানিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এথেন্সে প্রবেশ করে রাষ্ট্রশক্তির হাতের নাগালে আসতে হল না, অথচ এথেন্সের শিষ্য, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনের কাছাকাছিও থাকা গেল। শিষ্যরা প্রতিদিন সীমান্ত পেরিয়ে এসে গুরুর কাছে পাঠ নিয়ে দিনান্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারল– এবং এমনি করে ওই কুটিরটি একটি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। যে বাগানবাড়িতে প্লেটো আশ্রয় নিয়েছিলেন, ওই স্থানটি 'আকাদেমাস' নামক জনৈক ব্যক্তির নামের সঙ্গে জড়িত ছিল। ক্রমে জমির মালিক হারিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অতলে, আর তাঁর নামটি লাভ করল একটি নতুন অর্থ। 'আকাদেমি' হয়ে গেল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র অর্থাৎ স্কুল এবং হাজার বছরের পরিক্রমায় লাতিন, ফরাসি, ইংরেজি প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় academia, academic এরকম শব্দ ছড়িয়ে পড়ল (বার্ট্রান্ড রাসেলের Wisdom of the West বইটি এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

ঠিক যে প্রক্রিয়ায় শব্দটি পশ্চিম দিকে পরিক্রমা করেছিল, তেমনি পূর্বদিকেও ঘটল এর বিস্তার। আরবি ভাষায়ও 'আকদম' শব্দটি চালু হল। আমাদের দেশে 'Sahitya Akademi' নামটি 'একাডেমি' না রেখে 'সাহিত্য অকাদেমি' রাখা হয়েছে এ বিবেচনায়ই যে, যখন একটি বিদেশি শব্দকেই গ্রহণ করা হবে, তখন সাগর পারের ভাষা থেকে না নিয়ে আমাদের নিকট প্রতিবেশি 'আরব' দেশের ভাষা থেকেই শব্দটি নেওয়া হোক্। এ ব্যাপারে কৃতিত্বটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর। এ তথ্যটি জানিয়েছেন বিশিষ্ট লেখক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী তাঁর একটি রচনায়।

কি না; গবেষণা কর্মটি সুশৃঙ্খলভাবে করা হয়েছে কি না এর উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য লেখককে হতে হয় তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ, সৎ এবং নিরপেক্ষ, অর্থাৎ মানসিকভাবে সুশৃঙ্খল। তাঁর দায়বদ্ধতা থাকতে হবে সত্যের প্রতি, কোনও মতবাদ বা দল বা সম্প্রদায়ের সাময়িক স্বার্থের প্রতি নয়।

অ্যাকাডেমিক রচনার কর্মপদ্ধতিকে সামগ্রিকভাবে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়। একটি হল– তথ্য অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বা তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলা। এ পর্বে রয়েছে বিষয়-নির্বাচন, এবং অনুসন্ধানকর্মটিকে কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে এর সীমারেখা নির্দিষ্ট করা; কোন্ দিকে কতটুকু দৃষ্টিপাত করা এবং সাধারণভাবে একটি Hypothesis বা উপকল্প খাড়া করা, এবং গবেষণা কর্মটির সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত কী হতে পারে এর একটা সম্যক ধারণা গড়ে তোলা।

তাছাড়াও এ পর্বের প্রাথমিক কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত বিষয়ের উপর সমধর্মী রচনা থেকে বর্তমান কাজটি কতটুকু অভিনব হতে পারে, তা নির্দিষ্ট করা; রচনাটির উদ্দেশ্য কী, এর সামাজিক বা তাত্ত্বিক গুরুত্বই বা কতটুকু, তাও ভেবে নেওয়া।

অ্যাকাডেমিক রচনা পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্বটি হল পুরোপুরি টেকনিক্যাল। কোথায়, কীভাবে, কী তথ্য রয়েছে তা কীভাবে সংগ্রহ করা যায় এবং ব্যবহার করা যায় তা স্থির করা; কতটুকু লাইব্রেরি ওয়ার্ক আর কতটুকু ক্ষেত্রানুসন্ধান বা ফিল্ড-ওয়ার্ক করতে হবে, তা স্থির করে নেওয়া। সাহিত্য অর্থাৎ Pure literature-এর গবেষণাকর্ম পুরোপুরি লাইব্রেরি-সর্বস্ব হতে পারে, কিন্তু লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাষা, পরিবেশ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা নিবন্ধ লিখতে হলে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনও রয়ে গেছে, অর্থাৎ ক্ষেত্রানুসন্ধান বা Field study এসব ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, সামান্য একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্রিকা, স্মরণিকায় ছাপানোর জন্য, কিংবা Occasional paper হিসাবে প্রচারের জন্য, আলোচনা সভা/সেমিনারে পাঠের জন্য অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের Assignment, Project work-এর ক্ষেত্রে কি এসবের প্রয়োজন আছে? এর সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর হল– 'হ্যাঁ আছে।' মৌল পদ্ধতির ক্ষেত্রে Ph.D-র জন্য প্রস্তুত Thesis paper এবং Minor Research Project, কিংবা আকাদেমি পত্রিকা, রিসার্চ জার্নাল এবং লিট্‌ল ম্যাগাজিনের গবেষণাধর্মী নিবন্ধের মধ্যে গুণগত কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু ব্যাপ্তির, পরিসরের– গভীরতার নয়, চিন্তার নয়, নয় পদ্ধতিরও।

ক্ষুদ্র কলেবরে, সঙ্কীর্ণ পরিসরে, নিজস্ব ধরা ছোঁয়ার জগৎ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অ্যাকাডেমিক রচনার পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে আজকে যে-নবীন লেখক একটি গবেষণাধর্মী নিবন্ধ লিখে উঠতে পারছেন, আগামী দিনে তাঁর কাছে বিশাল গবেষণা-পত্র তৈরি করা অনেক সহজসাধ্য হয়ে যাবে। এ সমস্ত বিবেচনায় সম্ভবতঃ আজকাল বিভিন্ন

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতকোত্তর স্তরে Seminar paper, Dissertation এবং Assignment চালু হয়েছে।

ক্ষেত্রানুসন্ধান এবং গ্রন্থাগার-অন্বেষণ করে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে কোনও সিদ্ধান্তে যাবার আগে লেখককে তথ্যগুলোর সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে হবে অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্যসমূহকে cross-checked করে তারপরই গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। সংগৃহীত তথ্যকে বিচার বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া গবেষকের প্রধান কাজ।

এতটুকু প্রাথমিক কাজের পরই হ'ল প্রকল্পটি লিখতে বসার কাজ। এবং এখানেও সচেতন প্রয়াসেই শিখে নিতে হবে ভাষা ও শব্দের সঠিক প্রয়োগ, বাক্যগঠন এবং রচনাটির পারম্পর্য রক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া, পর্ব বিভাজন, উদ্ধৃতি ব্যবহারের প্রথা, টীকাভাষ্য, সূত্রনির্দেশিকা, নির্ঘণ্ট, শব্দ নির্দেশিকার সাধারণভাবে স্বীকৃত প্রথাসমূহ।

এবারে আমরা আরো সুনির্দিষ্টভাবে, উদাহরণ সহযোগে গবেষণা-নিবন্ধ রচনার প্রতিটি স্তর নিয়ে একে একে আলোচনা করব।

১। শিরোনাম (Title) :

গবেষণা নিবন্ধের শিরোনাম একেবারে অলঙ্কারবর্জিত, বিষয়ানুগ এবং অর্থবহ হতে হবে। এতে মূল শিরোনাম এবং উপ-শিরোনামও (Main title ও Sub-title) থাকতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে তা যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এবং সম্পূরক হয়, এটা মনে রাখতে হবে। যেমন, "বরাক উপত্যকায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা : কয়েকটি আলোচিত ও লোকায়ত তথ্য সূত্র" (অমলেন্দু ভট্টাচার্য, গবেষণা পরিষদ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, ১৯৯৫, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর)– এখানে শিরোনামের দু'টি অংশই পরস্পরের পরিপূরক এবং সম্পূরক। পাঠক শিরোনাম দেখেই লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আগাম ইঙ্গিত পেয়ে যাবেন।

আবার নিম্নলিখিত শিরোনামটিতে বিষয়টি সরাসরিই উপস্থাপন করা হয়েছে – প্রথমটির মতো এখানে কিন্তু পাঠকের বুঝে নেবার সময়টুকু ব্যয় করারও প্রয়োজন নেই।– "দ্বিজেন্দ্র কাব্যে দেশাত্মবোধের স্বরূপ" (জেব-উন-নেসা জামাল, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৩৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৪০১)।

গবেষণা পত্রিকা বা Research Journal, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পে আলঙ্কারিক শিরোনামের প্রথা নেই; কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য তো বটেই, বাংলা সাহিত্যেও গবেষণা-গ্রন্থ কিংবা নিবন্ধে আলঙ্কারিক শিরোনামের অভাব নেই। শঙ্খ ঘোষের 'ছন্দের বারান্দা', 'উর্বশীর হাসি', 'এ আমির আবরণ', অম্বুজ বসুর 'একটি নক্ষত্র আসে'– এরকম উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা, লিটল্ ম্যাগাজিনগুলোতেও চমৎকার সব আলঙ্কারিক নাম দিয়ে অ্যাকাডেমিক রচনা প্রকাশিত হয়। এ ধরনের রচনা যারা লিখেছেন বা লিখছেন এরা সৃজনশীল এবং মননশীল উভয় ধরনের রচনায়ই সিদ্ধহস্ত; এদের রচনাকৃতি

গবেষণামূলক রচনার শৃঙ্খলা থেকে বিচ্যুত হয়নি, যদিও সৃজনশীলতার রসও এতে বজায় রয়েছে। তবে এ কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ ধরনটি অনুকরণ করে সাফল্য লাভ করা সহজ নয়।

২। অধিতব্য বিষয় (Scope) :

রচনাটিতে কোন্ বিষয়ের সুনির্দিষ্ট কোন্ দিকে আলোকপাত করা হবে, কোন্ পথে অনুসন্ধানটি চালানো হবে– এর সম্ভাবনা এবং সমস্যাগুলো কী, অধিতব্য বিষয়টিকে জ্ঞানচর্চার কোন্ শাখায় সংস্থাপন করা যেতে পারে, এর যথাযথ সীমারেখাটি কী– এ সমস্ত বিষয়ই অতিসংক্ষেপে লিখে নিতে হবে। এখানে উদাহরণ হিসেবে একটি নিবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধার করা হ'ল :

> রবীন্দ্রপাঠকের অবিদিত নেই, যে কথা ও সুরের সংগতি নিয়ে কবিকে দীর্ঘদিন বিতর্কে ও আলোচনায় নামতে হয়েছে।... রবীন্দ্রনাথের গানে কথার বিশেষ মূল্য আছে। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হলেও মূল্যবান আলোচনা করেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। কথা বলতে শুধু শব্দকেই বোঝায় না, বাক্য এবং বাক্‌ভঙ্গিকেও বোঝায়। **এই প্রবন্ধে কেবল শব্দেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।** সুর সংযোগে কথা যে অনির্বচনীয়তা পায় তা এই আলোচনার বহির্ভূত।
>
> (বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, "রবীন্দ্রনাথের গানে শব্দের ব্যবহার", রবীন্দ্রসঙ্গীতায়ন-১, কলিকাতা, পৃ: ৩৪।)

এখানে একেবারে সুস্পষ্টভাবে লেখকের উদ্দেশ্য এবং আলোচনার সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হয়েছে; কোন্ দিকটি তাঁর আলোচনার অন্তর্গত এবং রবীন্দ্রসংগীতের কোন্ দিকটি তাঁর আলোচনার বহির্ভূত, তা একেবারে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। লেখকের এ প্রচেষ্টা যে একেবারে অভিনব নয়, তাও তিনি স্বীকার করেছেন। সন্তোষকুমার ঘোষের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটির উল্লেখ করে গবেষক হিসেবে নিজের সততাও প্রমাণ করেছেন লেখক। নবীন গবেষক এ উদাহরণের একটি জিনিসই শুধু বর্জন করবেন তা হ'ল 'আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব' অংশের 'আমার' শব্দটি। গৌরবার্থে বহুবচন করে নেওয়া যায়, নয়ত ভাববাচ্যেও লেখা যায়–।

৩। পূর্বলব্ধ জ্ঞান (Overview Literature) :

লেখক যে বিষয়টি ধরেছেন এ বিষয়ে বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুরূপ আর কী কী কাজ হয়েছে, প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত কী কী রচনা হয়েছে– এ'র একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ (তালিকা নয়) দিতে হবে। মূল রচনাটির এটাও একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৪। উপকল্প (Hypothesis) : *

লেখক কী প্রমাণ করতে চাইছেন এ বিষয়ে তাঁর ধারণা একেবারে স্বচ্ছ থাকা চাই। প্রাথমিক অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও মননের পর যতক্ষণ পর্যন্ত না লেখক একটি বাক্যে বলতে পারবেন যে তাঁর Thesis-টি কী, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়েছে, তা বলা যাবে না। রচনাটি তৈরি করার আগে নিজের কাছে এটা একেবারে পরিষ্কার হওয়া চাই, 'আমি কী বলতে চাইছি' অর্থাৎ 'আমার প্রতিপাদ্যটি কী'। এবং এটা নিরূপিত হয়ে গেলে রচনাকর্মে, ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার কাজটি একটি সুসংবদ্ধ নাটকের প্রথম দৃশ্য থেকে ক্লাইমেক্স হয়ে Denouement-এ পৌঁছে যাওয়ার মতই সহজ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা সুজিৎ চৌধুরীর 'প্রাচীন ভারতে মতৃপ্রাধান্য ঃ কিংবদন্তীর পুনর্বিচার' (কলকাতা, ১৯৯০) বইটিকে দেখতে পারি। লেখক এ বইটিতে আপাতঃ বিচ্ছিন্ন চারটি নিবন্ধ নিয়ে প্রাচীন ভারতে সমাজগঠনের ইতিহাসের একেবারে সূচনা পর্বে যে মাতৃতান্ত্রিকতা প্রচলিত ছিল– এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এই মাতৃপ্রাধান্য, শ্রী চৌধুরীর মতে, লাঙ্গলভিত্তিক কৃষি-সংস্কৃতির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও মাতৃতান্ত্রিকতার স্বাক্ষর রয়ে যায় পিতৃতান্ত্রিক আধুনিক সমাজের বিভিন্ন ধর্মাচার এবং লোকাচারের মধ্যে, রয়ে যায় লোকায়ত সংস্কৃতি এবং কিংবদন্তীর মধ্যেও। লেখকের উপকল্প বা Hypothesis একেবারে সুস্পষ্ট, এবং এটাকে সামনে রেখে তিনি লোকসংস্কৃতি থেকে তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে থাকেন, বিশ্লেষণ করতে থাকেন প্রাপ্ত কিংবদন্তীগুলো– এবং যুক্তি দ্বারা এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজ ইতিহাসের কাল বিচারে নেহাৎই অর্বাচীন; মাতৃতান্ত্রিকতাই প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বাস্তব সত্য। পিতৃতান্ত্রিকতার কাছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এ মাতৃতন্ত্র পরাভূত হলেও, মাতৃতান্ত্রিকতার স্বাক্ষর এখনও সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের লৌকিক পূজাপার্বণ এবং শ্রুতিপরম্পরা ও কিংবদন্তীতে।

৫। তথ্যসূত্র (Source Materials) :

লেখকের সম্ভাব্য তথ্যসূত্র কী– তা নিরূপণ করা এবং কোন্ সূত্রটি প্রাথমিক (Primary source) এবং কোন্‌টি পরোক্ষ (Secondary source) তা নিরূপণ করা গবেষণা নিবন্ধ রচনার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। যে তথ্য সরাসরিভাবে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ গবেষণা কর্মটির অভীষ্টে পৌঁছানোর জন্য অত্যাবশ্যক, তা'ই প্রাথমিক তথ্য-সূত্র; আর যে সূত্রের স্বীকৃতি প্রয়োজন, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে এর প্রত্যক্ষ কোন অবদান নেই– তা'ই পরোক্ষ সূত্র হিসেবে চিহ্নিত হবে।

---

* হাইপোথিসিসের প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রকল্প' শব্দটিই চালু। কিন্তু আজকাল 'প্রকল্প কথাটার কাজ পাল্টে গেছে'।... খবরের কাগজ ইত্যাদি গণমাধ্যমে 'প্রকল্প' শব্দটি একটু ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'উপকল্প' শব্দটি ব্যবহার করেছেন প্রবাল দাশগুপ্ত 'কথার ক্রিয়াকর্ম' (কলি- ১৯৮৭ পৃ: ১২১-১২২) বইতে।

রচনাটি যদি একটি সেমিনার-পেপার হয় বা সাময়িক পত্রিকা কিংবা র্জানালের জন্য লিখিত হয়, তবে তথ্য সূত্রের বিবরণী নিবন্ধের মূল text এর মধ্যেই দিতে হবে সংক্ষিপ্ত আকারে। দীর্ঘপ্রকল্পে অবশ্য Bibliography বিভাগে বই, পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য সূত্রের তালিকা দিতে হবে। Notes and reference পর্বে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ীই সমস্ত সূত্র তালিকাভুক্ত করতে হবে। অবশ্য সেমিনার পেপারেও Bibliography বা reference notes থাকতে হবে।

৬। **পদ্ধতি (Methodology) :**

অনুসন্ধান কর্মটি কীভাবে চালানো হবে, এর পদ্ধতিগত কি কোন অভিনবত্ব আছে, প্রবন্ধটি কীভাবে একটি সুপরিকল্পিত, বৈজ্ঞানিক বা তাত্ত্বিক কাঠামোর (theoretical frame work) মধ্যে স্থাপন করা হবে, এটা সুস্পষ্টভাবে লিখে নিতে হবে নিবন্ধের text এ'ই।

প্রতিটি গবেষণা-কর্মেরই একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে এবং একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যেই তা সংস্থাপন করা হয়। মার্কসীয় পদ্ধতি, সাব-অলটার্ন পদ্ধতি, উত্তরাধুনিক পদ্ধতি– এরকম এক একটা তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে আধুনিক গবেষকরা অনুসন্ধানে ব্রতী হন। তবে পূর্ব নির্ধারিত কোন তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক কাঠামো ছাড়াও traditional অর্থাৎ প্রথানুগ পদ্ধতিতেও গবেষণা-নিবন্ধ রচনা করা সম্ভব এবং তা হচ্ছেও।

তাত্ত্বিক কাঠামো কীভাবে গড়ে তোলা হয় এর একটি উদাহরণ রয়েছে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে –

> ... রূপকথা, লোককথা, উপকথার বিশ্লেষণে আমরা কয়েকটি প্রধান ধারা দেখতে পাই। একটি ধারার উৎপত্তি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের পথে।... দ্বিতীয় ধারাটি মূলতঃ সমাজতাত্ত্বিক। এখানে উপকথা ও রূপকথাকে দেখা হয়েছে বিশেষ সমাজ সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে মানব মনের বিচিত্র প্রকাশ রূপে।...
>
> রূপকথা চর্চার তৃতীয় ধারাটির প্রবক্তা হলেন উইলিয়াম হফার। বর্তমান বিশ্লেষণের জন্য আমরা এই তিন ধারার বিচারভঙ্গীরই কথা স্মরণ রাখব। রূপকথার কোন বিশেষ, একটি কাহিনিকে অবলম্বন করে আমরা অগ্রসর হব।...
>
> (জয়ন্তী বসু ও সৌগত রায়, "মনঃসমীক্ষণের নিরিখে ঠাকুরমার ঝুলির দুটি কাহিনি", অনুষ্টুপ, ৩১ বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ: ১০৪)

এখানে গবেষণা পদ্ধতির একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা গড়ে তোলা হয়েছে, কী ধরনের বিচারভঙ্গি লেখকরা অবলম্বন করবেন তাও এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এবং এর ফলে আমরা দেখতে পাব যথেষ্ট জটিল এ বিষয়টির উপর অধ্যয়ন এবং গবেষণার কাজটি সহজ হয়ে যাবে। লেখকের কাজ যেমন সহজ হবে, তেমনি পাঠকদের বোঝার কাজও সহজ হবে।

গবেষণা-নিবন্ধের একটি সুস্পষ্ট আদি, মধ্য এবং অন্ত্য থাকে। আদি পর্বে লেখকের উদ্দেশ্য, প্রতিপাদ্য, পদ্ধতি, তথ্যসূত্র এবং তাত্ত্বিক কাঠামো– এসব কিছুই ব্যক্ত হবে।

মধ্য পর্বে থাকবে তথ্যের সন্নিবেশ এবং বিশ্লেষণ, এবং অন্ত্যে থাকবে অনুসন্ধানের ফলাফল বা লেখকের সিদ্ধান্ত।

গবেষণা-নিবন্ধে লেখক নিজেই একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং এর উত্তর নিরূপণের ভারও নিজের উপর। তাই এ ধরনের কাজে লেখককে নিজেই স্থির করে নিতে হয়, আমি কী ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজ করতে চাই। অর্থাৎ প্রাথমিক অনুপ্রেরণা আসা চাই লেখকের নিজের ভেতর থেকেই। অন্য কেউ স্থির করে দেবে (কোন প্রতিষ্ঠান বা রিসার্চ গাইড) আমি কীসের উপর গবেষণা করব– এ ধরনের কাজে উপলক্ষটাই বড় হয়ে যায়, লক্ষ্যটা হয়ে যায় গৌণ।

অ্যাকাডেমিক জার্নাল বা সাময়িক পত্রিকায় অবশ্য সবসময় সম্পাদকের পক্ষ থেকে কোনও চাপ থাকে না– লেখকরা নিজস্ব অভিরুচি অনুযায়ী রচনা তৈরি করে পাঠাতে পারেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত গবেষণা প্রকল্প গৃহীত হয়, সেগুলো প্রায়শই 'গাইড' এর পরামর্শে হয়, এ ক্ষেত্রে গবেষকের উপর কিছুটা আরোপিত সীমাবদ্ধতা অনিবার্য হয়ে পড়লেও, এ প্রক্রিয়ায় উন্নতমানের কাজ হয়েছে এবং হচ্ছেও, এটা অস্বীকার করা যাবে না। এখন গবেষণা নিবন্ধ রচনার আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, তথ্যসূত্র, টীকাভাষ্য, (Foot notes, Reference notes) পুস্তক তালিকা (Bibliography), ইত্যাদিতে যাবার আগে আরো কয়েকটি প্রাসঙ্গিক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক।

গবেষণা-নিবন্ধ যদি লিট্‌ল ম্যাগাজিন বা সাহিত্য সাময়িকী বা অনুরূপ কোথাও (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বহির্ভূত স্থানে) প্রকাশের জন্য রচিত হয়– তবে এতে লেখক এত যান্ত্রিক ভাবে পদ্ধতি ও রীতিনীতি পালনের পথে না গিয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিতে পারেন এবং এর ফলে কিছুটা সৃজনশীল প্রবন্ধের লক্ষণ এতে এসে গেলেও তা নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হবে না। মিশ্র আঙ্গিকে (academic & non-academic) এ ধরনের লেখা 'চতুরঙ্গ', 'অনুষ্টুপ', 'জিজ্ঞাসা' এবং 'দেশ' পত্রিকায়ও দেখা যায়। কেতকী কুশারী ডাইসন এ আঙ্গিকে খুব সিদ্ধহস্ত। সুজিৎ চৌধুরীর 'বরাক উপত্যকার দুখিনী বর্ণমালা' (স্মরনিকা, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ১০ম অধিবেশন, শিলচর- ১৯৯১) নিবন্ধটি একটি উল্লেখযোগ্য মিশ্র আঙ্গিকের রচনা, যেখানে অ্যাকাডেমিক শৃঙ্খলা সত্ত্বেও রচনাটি পাঠকমনে মাতৃভাষার উপর আগ্রাসনের স্বরূপ উপলব্ধিতে একটি গভীর বিষাদ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। তবে পরিমিতি বোধ এবং শৃঙ্খলাবোধের সামান্যতম ঘাটতি হলেই মিশ্র আঙ্গিকের রচনা অ্যাকাডেমিক বৈশিষ্ট্য হারাবে, আবার একটি জনপ্রিয় বা populist রচনাও হয়ে উঠতে পারবে না।

আসলে প্রত্যেক সার্থক সৃজনশীল লেখকের ভেতরই একজন শৃঙ্খলিত গবেষক লুকিয়ে থাকেন। একেবারে পপুলিস্ট ফিচার লেখকও ভেতরে ভেতরে একজন নিষ্ঠাবান

গবেষক। তিনি শুধু বিষয়ভিত্তিক গবেষকই নন, পাঠক মনস্তত্ত্ব, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা– এসমস্ত বিষয়ে তাঁর সচেতনতা অনেক বেশি প্রখর, সূক্ষ্ম এবং সুসংবদ্ধ। দর্শন-তত্ত্ব-তথ্য-ফ্যাশন-যৌনতা-কাব্য মিশিয়ে মাঝে মাঝে বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় রচনা এরা লেখেন যার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণকে এড়াতে পারেন না একেবারে সিরিয়াস পাঠকও। পশ্চিমের ডকু -ফিকশনগুলো হচ্ছে এ ধরনের রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। Is Paris Burning, Freedom at Midnight, O Jerusalem বইগুলো যে কত বিরাট গবেষণা-ভিত্তিক রচনা, তা ইতিহাস-রাষ্ট্রবিজ্ঞান-আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করবেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ বইগুলোকে ইতিহাসের তথ্যসূত্র হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে না কখনওই। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংকট, বিশেষ করে আসামে আলফা সমস্যার প্রেক্ষাপটে রচিত সঞ্জয় হাজারিকার The strangers of the Mist এমনই একটি পপুলিস্ট বই যার লেখকের ভেতর একজন গবেষক লুকিয়ে রয়েছেন।

গবেষণা-নিবন্ধের ভাষার দিকটিও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার দাবি রাখে। এখানে সৌন্দর্য সৃষ্টি, ভাষার লালিত্য, উপমা, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা– এসবের কোন স্থান নেই। শৃঙ্খলপরায়ণতা এ রচনার চরম লক্ষ্য। লেখককে হতে হবে স্বল্পভাষ। তাঁকে অতি-কথন সর্বদাই বর্জন করতে হবে।

স্পষ্টীকরণের জন্য যদি একটি বাক্য দীর্ঘ হয়ে পড়ে, যদি এতে একাধিক বিরতি চিহ্ন– কমা, সেমিকোলন, ড্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয় এবং এর ফলে বাক্যের সাহিত্য গুণ যদি কিঞ্চিৎ হারায়ও, তবু এতে লেখকের কিছুই করার নেই। তাঁকে শুধু লক্ষ রাখতে হবে, বাক্য জটিল হলেও ভাষায় যেন অস্পষ্টতা না থাকে।

প্রয়োজনে এবং সম্ভাব্যস্থলে নির্দিষ্ট বিষয়ের পরিভাষাও ব্যবহার করতে হবে। লেখককে তাঁর 'টার্গেট-রিডার' কারা, এ কথাটা সব সময়ই মনে রাখতে হবে।

রচনার ভাষা যেন কখনোই লঘু বা চটুল হয় না, এদিকেও নজর রাখতে হবে। উইট (wit) ও হিউমার (humour) বর্জিত ভাষায় একটি সিরিয়াস টোন রাখতেই হবে এবং কটাক্ষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, কঠোর সমালোচনা, বক্রোক্তি, অতিশয়োক্তি গবেষণা-নিবন্ধে সর্বদাই পরিত্যাজ্য।

সূত্র নির্দেশিকা, টীকা, উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে

যেহেতু গবেষণা-নিবন্ধ বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব, পূর্বলব্ধ জ্ঞানের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল সেহেতু এতে ব্যবহৃত সমস্ত তথ্যাবলীর সূত্র সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিতে হবে। এ কাজটি দুভাবে করা যেতে পারে–।

এক, মূল রচনার মধ্যেই অর্থাৎ Text-এর ভেতরই একটি ব্র্যাকেট দিয়ে, যেমন–

> "Times পত্রিকায় সম্পাদক বলেছিলেন, যে এটা আসলে ভুল ধারণা যে আমরাই পাঠকের চাহিদা তৈরী করি। আসলে পাঠকরাই স্থির করে দেন

আমরা ওদের জন্য কী দেব বা ওরা কী জানতে চান (Musings of a Newsmagazine Editor, Mass communication, ed, Emery & Smythe)"

এখানে কোন্ বইয়ের কোন্ বিশেষ রচনা থেকে তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে তা দেওয়া হল এই ব্র্যাকেটের ভেতর। যেহেতু এ তথ্যটি Foot note এ দেওয়া হল না, তাই এর বেশি তথ্য (প্রকাশনার স্থান, সন্ সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা) দেবার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই, কারণ এ প্রথাটি সাময়িক পত্রিকা ম্যাগাজিনেই প্রচলিত। রিসার্চ জার্নালে বা সেমিনার-পেপারে তা চলবে না। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় আবার তারকা চিহ্ন (*) দিয়ে পৃষ্ঠার নীচে সূত্র নির্দেশও দেওয়া হয়।

দুই, চলতি পঙক্তির মধ্যে সম্ভাব্য স্থলে সূত্র সংখ্যা ক্রম অনুযায়ী বসিয়ে (–১,–২, এরকম) রচনা শেষে সমাপ্তি চিহ্নের পূর্বে এই ক্রম অনুযায়ী (১), (২), এরকম করে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র, টীকা ভাষ্য দেওয়া যায়। সূত্র নির্দেশিকা বা Reference notes এ প্রদত্ত সূত্রটি সাজানো হবে নিম্বরূপ–

- প্রথমে (বই-এর) লেখকের নাম,
- এরপর বই এর নাম (underlined)
- এরপর প্রকাশনার স্থান, সন,
- সর্বশেষে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা সংখ্যাটি–

যেমন, ১। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, কলিকাতা ১৪০০ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ), পৃঃ ৩৪।

আবার নিবন্ধের ক্ষেত্রে

- লেখকের নাম
- নিবন্ধের শিরোনাম (উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে "–", (Underlined নয়)
- যে বই বা পত্রিকায় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তার নাম (underlined)
- প্রকাশনার স্থান, সন
- পৃষ্ঠা সংখ্যা থাকলে উল্লেখ করা, নইলে পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই (n.p) লিখলে চলে, না লিখলেও চলে–

উদাহরণ–

২। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, "লৌহিত্য-পূর্ব ভূখণ্ডের প্রত্নৈশ্বর্য", আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

একটি বই বা নিবন্ধ একাধিকবার তথ্যসূত্রে উল্লেখ করতে হলে বার-বার প্রকাশনার স্থান, সন ইত্যাদি দেবার প্রয়োজন নেই। যদি পরপর একই সূত্র আসে, তখন 'তদেব' বা 'পূর্বোক্ত' লিখে পৃষ্ঠা সংখ্যাটি দিলেই হয়। ইংরেজিতে এক্ষেত্রে Ibid, এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য বার বার উল্লেখের পরিবর্তে Op. cit., লিখে দেওয়া হয়। বাংলা রচনায়ও এসব ব্যবহার করা হয়।

বাংলা নিবন্ধে ইংরেজি বা অন্য ভাষার বই, নিবন্ধ উল্লেখ করতে হলে সরাসরি ইংরেজিতে বা অন্যভাষায় (হিন্দী, অসমিয়া) লিখে দেওয়া চলে– আবার লিপ্যান্তর করেও দেওয়া যায়, যেমন,

১। আর, এম, নাথ, ব্যাকগ্রাউণ্ড অব অ্যাসামিজ কালচার, শিলং ১৯৪৯, পৃঃ ৫৬।

২। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'কোপার-প্লেট ইনস্ক্রিপশনস ফ্রম সিলেট', প্রসিডিংস অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ১৮, কলিকাতা, ১৮৮০, পৃঃ ১৪১-১৪৩।

৩। উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, অ্যা স্টাডি অব দ্য কাছাড় ডায়ালেক্ট অব বেঙ্গলি, অপ্রকাশিত Ph.D. গবেষণা পত্র, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮।

উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে :

গবেষণা-নিবন্ধে উদ্ধৃতি দেবার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রথা রয়েছে। একটি বা দুটি পঙক্তি হলে সরাসরি উদ্ধৃতি চিহ্ন ("–") দিয়ে টানা লাইনের মধ্যেই বসানো যায়, কিন্তু দীর্ঘ উদ্ধৃতি হলে রচনার মধ্যে দুই ইঞ্চি বা আরো কম গ্যাপ দিয়ে single space এ বা বাঁকা হরফে (Italics) কিংবা bold অক্ষরে অংশটি বসাতে হবে (এ রচনায় এরকম উদ্ধৃতি রয়েছে) লক্ষণীয়, এ ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্নের প্রয়োজন নেই।

আর আরো দীর্ঘ উদ্ধৃতি হলে, যদি তা একাধিক প্যারাগ্রাফের হয় তবে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিতে হবে প্রতিটি প্যারাগ্রাফের শুধু শুরুতে এবং উদ্ধৃতি-সমাপ্তি চিহ্ন (–") আসবে পুরো অংশের শেষে।

উদ্ধৃত অংশের মধ্যেই আবার যদি কোনও শব্দ বা বাক্যবন্ধ উদ্ধৃত থাকে, তবে প্রথমটিকে দুটি উদ্ধৃতি চিহ্ন ("–") এবং মধ্যের উদ্ধৃত অংশটি একটি চিহ্নের ('–') মধ্যে আনতে হবে।

টানা লাইনের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একটি অংশ উদ্ধার করলে অনেক সময় তা খাপছাড়া মনে হয়, তাই এক্ষেত্রে তিনটি বিন্দু (...) দিতে হবে (এ পদ্ধতির উদাহরণও এ রচনায় রয়েছে)।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আরো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভ্রান্তি সংশোধন। যদি মূল মুদ্রিত পাঠে বা পাণ্ডুলিপিতে, কিংবা দলিল পত্রাদি, তাম্রপত্র, অথবা প্রস্তরলিপিতে কোন অশুদ্ধ শব্দ, ভুল বানান থাকে, তবে লেখক যখন তা থেকে উদ্ধৃতি দেবেন, তিনি কী করবেন? শুদ্ধ করে লিখে নেবেন, না অপরিবর্তিত রেখে দেবেন?

এ-ক্ষেত্রে দুটো প্রথা রয়েছে : লেখক শব্দটিকে অসংশোধিত রূপে রেখে দিতে পারেন, আবার শুদ্ধ করেও দিতে পারেন– তবে উভয় ক্ষেত্রেই শব্দটির ডানে [sic] এ-সংকেতটি বসাতে হবে; এতেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন এ ভুলটি লেখকের চোখ এড়িয়ে যায়নি; আবার লেখক বানানটি শুদ্ধভাবে বসাতে চাইলেও ওই [sic] সংকেতের পর দ্বিতীয় বন্ধনীটির ভেতরই মূল অশুদ্ধ বানানটি দিতে পারেন। কিন্তু সংকেত চিহ্ন না

বসিয়ে সংশোধনের অধিকার উদ্ধৃতিদাতার নেই, তা সে যতবড় ভুলই হোক্ না কেন।

লেখকের সামান্য অসাবধানতায়, কিংবা সম্পাদক, মুদ্রকের অসাবধানতায় এরকম অনেক ভুলই ঘটে থাকে, যার দায় ভার বয়ে যেতে হয় প্রজন্মের পর প্রজন্মকেই। উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ লিখিত 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' (১৯১২, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭১, গৌহাটি)– বইতে এরকম একটি ভ্রান্তির দায়ভার সম্ভবতঃ আমাদের চিরকালই বয়ে যেতে হবে। এই বই-এর ৮নং পৃষ্ঠায় বরাক উপত্যকার সোনাই-এর ভুবনেশ্বর শিবমন্দিরের দুটো প্রস্তরলিপির পাঠ দেওয়া আছে। প্রথম লিপিটিতে (সংস্কৃত-বাংলা, ১৭০৭ শকাব্দ, ১৭৮৫ খ্রিঃ এর লিপি) রয়েছে 'স্বর্ণপুর নগর মধ্যে চন্দ্রগিরি...'; কিন্তু 'কাছাড়ের ইতিবৃত্তে' লেখা হয়েছে... 'চক্রগিরি'। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস-গবেষক এ লিপির উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁদের রচনায়– 'স্বর্ণপুর নগর মধ্যে চক্রগিরি...'। সর্বজন স্বীকৃত একটি মূল্যবান ইতিহাস বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া কোন অসঙ্গত কাজও নয়, মূল লিপি সবার পক্ষে গিয়ে দেখা এবং পাঠোদ্ধার করাও সম্ভব নয়। এবং এভাবে 'চন্দ্রগিরি পাহাড়টি 'চক্রগিরি' তে রূপান্তর' হয়ে যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে। মুদ্রিত বইতে 'চন্দ্রগিরি' কে 'চক্রগিরি' বানানোর কৃতিত্বটা কার আমরা জানি না, কিন্তু আগামী দিনের গবেষককে এ ভুলের বোঝা বয়ে যেতেই হবে। যারা প্রত্যক্ষভাবে শিলালিপিটি দেখবেন এবং পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হবেন (এ কাজটাও বিশেষ প্রশিক্ষণ সাপেক্ষ) তাঁরা অবশ্যই [sic] সংকেত সহ লিপিটির উদ্ধৃতি দেবেন। কিন্তু যারা ভুবনেশ্বর শিবমন্দির দর্শন করতে 'স্বর্ণপুর নগরে', অর্থাৎ সোনাইতে যাবেন না, তারা তো ভুল পাঠই গ্রহণ করবেন।

আসলে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের ওই প্রস্তরলিপির অক্ষরগুলো এখন একেবারে জরাজীর্ণ, ঝাপসা হয়ে গেছে, বছর খানেকের মধ্যেই হয়তো বা ঝরে পড়বে চুন সুরকির এ লিপিটি; এবং এরপর থেকে 'কাছাড়ের ইতিবৃত্তের'র পাঠই হবে এ লিপিটির একমাত্র নির্ভরযোগ্য পাঠ, তখন কতিপয় লেখকের ব্যবহৃত [sic] সংকেত কি একটি সর্বজন স্বীকৃত বইয়ের মারাত্মক এ ভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়ে যেতে পারবে?

সূত্র উল্লেখ প্রসঙ্গে আরও কিছু

যা কিছু মুদ্রিত, তাই বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সূত্র হবে, এ ধারণাটা সর্বৈব মিথ্যা। সুমুদ্রিত, মূল্যবান বই বা পত্রপত্রিকায় প্রায়শই ভ্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়, যার ফলে এসব বই পত্রকে সূত্র হিসেবে গ্রহণ করা অনুচিত। কিছু কিছু ভুল হয় অজ্ঞতার কারণে, কিছু কিছু হয় অসাবধানতায় আর, কিছু কিছু হয় ইচ্ছাকৃত। এ তিনটি ভুল সম্বন্ধেই গবেষকদের সচেতন থাকতে হবে। স্থানীয়, আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্রে প্রতিনিয়তই ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়, এবং এজন্য এ সমস্ত প্রকাশনা থেকে নির্বিচারে তথ্য সংগ্রহ করা একেবারেই উচিত নয়। যেমন বিগত একটি দশকে আসামে মোট কতটি ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হয়েছে এ তথ্য কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ বা রিপোর্ট থেকে না নিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর রিপোর্ট

থেকে নিলে সেটা হবে গ্রহণযোগ্য। শিলচর শহরের বা বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা কত-এ পরিসংখ্যানটি যদি স্থানীয় একটি পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়, পণ্ডিত মহলে তা গ্রাহ্য হবে না। Statistical Handbook of Assam থেকেই সংখ্যাটি উদ্ধার করতে হবে এবং পত্রিকার পরিবর্তে ওই Handbook-টিই তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বা মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে কোন তথ্যের জন্য Whose Who ধরনের বই, G.K., Hindustan Year book এর শরণাপন্ন হলে গবেষণা নিবন্ধের মান একেবারে নেমে যাবে। স্কুল পাঠ্য text book, প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি প্রকাশিত M.A, LLB., BT., PhD. ডিগ্রিযুক্ত কোন লেখক রচিত সহায়ক বই, নামগোত্রবিহীন প্রকাশনার বই কখনওই তথ্যসূত্র হিসেবে গ্রাহ্য হয় না।

ধরুন চলচ্চিত্র-সাংবাদিক একটি সুন্দর সাহিত্য সমালোচনা লিখেছেন। এখন একটি অ্যাকাডেমিক রচনায় যদি ওই নিবন্ধটিকেই তথ্যসূত্র হিসেবে ধরা হয়, তা খুব প্রশংসনীয় নাও হতে পারে, বিশেষ করে এ ধরনের তথ্য কোনও স্বীকৃত সাহিত্য গবেষক বা সমালোচকের লেখায় যদি সহজলভ্য হয়ে থাকে। একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ মধ্যযুগের অর্থনীতি নিয়ে একটি সুন্দর নিবন্ধ লিখে নিতেই পারেন– কিন্তু এ বিষয়ের গবেষক যদি ওই একই বিষয়ে সর্বজন স্বীকৃত গবেষকদের বাদ দিয়ে এই বিশেষ লেখকের রচনাটিকেই সূত্র হিসেবে ধরে বসেন, সেটা খুব সুবিবেচকের কাজ হয়েছে বলা যাবে না। কোন্ সূত্রটি referable আর কোনটি নয়, এটা সুচিন্তিতভাবে নির্ধারণ করাটা গবেষণা-নিবন্ধের লেখকের অত্যাবশ্যক কাজ।

কোথায়, কখন, কী সূত্রের উল্লেখ করতে হবে এটাও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। 'আসাম ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত' লিখে যদি Altas of India, O.U.P., Calcutta এ সূত্রের উল্লেখ করা হয়, সেটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার হবে যদি রচনার বিষয়বস্তু হয় আসামের বিহুনৃত্য বা আসামের চা শিল্প। আবার যদি National Geographical Society র জার্নালে আসামের ভূপ্রকৃতির উপর লিখিত নিবন্ধে এ সূত্র-উল্লেখ না থাকে, সেটাও সমালোচনার যোগ্য হবে।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল ১৮৬১ তে, এ কথাটির যার্থার্থ্য প্রমাণের জন্য যদি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বা প্রশান্তকুমার পালের বইএর পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়, এটা একেবারে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সাধারণভাবে একটি গবেষণা নিবন্ধ, সেমিনার পেপার বা Assignment এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তবে Occasional Paper, Dissertation, Project Report-এ আরো অনেক কিছুই সংযোজন করতে হবে; এর মধ্যে রয়েছে,

(ক) একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ (abstract)

(খ) (প্রয়োজনে) ম্যাপ, স্কেচ, সারণি

(গ) Abreviation- সূত্র (যেমন NEHU, North East India Hill University,

ICSSR, Indian Council of Social Science Research এসব)

(ঘ) Bibliograpy বইপত্র
- Primary source
- Secondary source

(ঙ) পরিভাষা পরিচিতি

(চ) নির্ঘণ্ট

(ছ) সূচিপত্র

(জ) ভূমিকা

(ঝ) কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এখানে বর্ণিত পদ্ধতিই যে অ্যাকাডেমিক রচনার একমাত্র পদ্ধতি, তা নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এমনকী বিশেষ বিশেষ রিসার্চ গাইডও পদ্ধতির মধ্যে অদল বদল করে থাকেন। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পদ্ধতির সঙ্গে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পদ্ধতির কিছু না কিছু পার্থক্য থাকেই। NEHU জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধের সঙ্গে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধের পার্থক্য থাকবেই, যেমন পার্থক্য 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা'র পদ্ধতির সঙ্গে Economic and Political Weekly (EPW)-র পদ্ধতির। ICSSR বা ICHR প্রভৃতি সংস্থা, যারা গবেষণামূলক কাজে সহায়তা করে থাকেন ওদের গবেষণা পদ্ধতির নিজস্ব কিছু বিধিই রয়েছে যা ওদের থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া যায়। কিন্তু তবুও একথাটি মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা-পদ্ধতির এ পার্থক্য নিতান্তই বহিরঙ্গ, মৌল পদ্ধতির নয়।

দু একটি অ্যাকাডেমিক নিবন্ধ রচনা করে নিলে লেখক নিজেই পদ্ধতির অদল বদল করে নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী কাজ করার ধরনটা রপ্ত করে নেবেন এতে সন্দেহ নেই এবং এ কাজটি রপ্ত করতে হলে, সেই আগের কথাটির পুনরাবৃত্তি করেই বলতে হবে যে, সমধর্মী অ্যাকাডেমিক রচনা খুব নিবিড়ভাবে পড়তে হবে এবং সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সূক্ষ্মভাবে দেখে নিতে হবে, অর্থাৎ বই পড়া হয়ে উঠতে হবে 'বই দেখা'ও।

নিজের সঙ্গে নিজে :

১. অ্যাকাডেমিক রচনা আর প্রবন্ধ/নিবন্ধ/প্রতিবেদনের প্রধান পার্থক্য কী?
২. মিশ্র আঙ্গিকের রচনা (গবেষণা-নিবন্ধ) বলতে কী বোঝায়?
৩. অ্যাকাডেমিক রচনার উদ্দেশ্য কী?
৪. রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তরের' রচনাগুলো কি অ্যাকাডেমিক রচনা?
৫. অ্যাকাডেমিক রচনায় বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের পদ্ধতি কী?
৬. অ্যাকাডেমিক রচনায় লেখকের দায়বদ্ধতা কীসের প্রতি এবং কেন?
৭. Hypothesis বা উপকল্প বলতে কী বোঝায়?

৮. বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, বা তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি সাহিত্যের উপর অ্যাকাডেমিক নিবন্ধ, অথবা পবিত্র সরকারের ভাষাতত্ত্ব, জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্যের ইতিহাস কিংবা অমলেন্দু ভট্টাচার্যের একটি লোকসংস্কৃতির উপর গবেষণা নিবন্ধ নিয়ে নিম্নলিখিত দিকগুলো বিবেচনা করুন–

(ক) রচনার টাইটেল কতটুকু অর্থবহ?

(খ) লেখকের প্রতিপাদ্য কী?

(গ) লেখক কি প্রথানুগ (traditional) পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, না কোনও বিশেষ তত্ত্বকে অবলম্বন করেছেন?

(ঘ) লেখকের তথ্যসমূহ কোন্ সূত্র থেকে সংগৃহীত– লাইব্রেরি না ফিল্ডস্টাডি, না উভয় সূত্র থেকেই?

(ঙ) লেখক কি তাঁর ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন?

(বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, নাটক, শিল্পকলার ছাত্র/গবেষকরা নিজ নিজ বিষয়ের ইংরেজি বা বাংলা নিবন্ধ নিয়েও একই পদ্ধতিতে অনুশীলন করতে পারেন)

পর্ব ৪

সমালোচনা

সমালোচনা : গ্রন্থ সমালোচনা, শিল্প সমালোচনা রেডিও-টিভি পর্যালোচনা, অবিচ্যুয়ারি লিখন

প্রসঙ্গ সমালোচনা

সমালোচনামূলক রচনা প্রিন্ট মিডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দৈনিক পত্রিকার সাময়িকী, বিশেষ সংখ্যা (নববর্ষ, পঁচিশে বৈশাখ, সাহিত্য সম্মেলন, লোক উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্র), সাহিত্য পত্রিকা, লিট্‌ল ম্যাগাজিন ছাড়াও রিসার্চ জার্নাল বা অ্যাকাডেমিক পত্রিকায় সমালোচনার জন্য বিশেষ স্থান সংরক্ষিত থাকে।

এ সমালোচনার মধ্যে রয়েছে গ্রন্থ সমালোচনা, ম্যাগাজিন সমালোচনা, সংগীত-নাটক চিত্রকলা সমালোচনা, রেডিও-টিভি পর্যালোচনা বা রিভিউ। তা ছাড়াও রয়েছে চলচ্চিত্র, নাটক সমালোচনা। লক্ষ করলেই দেখা যাবে এ সমালোচনা ছাড়া গণমাধ্যম এবং সাহিত্য পত্রিকা প্রায় অচলই।

লিট্‌ল ম্যাগাজিন বা সাহিত্য পত্রিকার সমালোচনা-লিখন কর্ম যদিও এখনও বৃত্তিমূলক কাজ হয়ে উঠতে পারেনি (মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক লিট্‌ল ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্রিকা ছাড়া)– তবুও সংবাদপত্র কিংবা ব্যবসায়িক সাহিত্য পত্রিকা, নিউজ ম্যাগাজিনে সমালোচনা-লিখন কর্মটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব।

এখানে প্রথমেই একটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে, পত্রপত্রিকার সমালোচনা লিখনকে সমালোচনা সাহিত্যের (Literary Criticism) সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না; সমালোচনা-সাহিত্যের অনেক উপাদান এতে থাকলেও এ সমালোচনার রীতি-নীতি পদ্ধতি প্রকরণ, ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের ধরন ভিন্ন। এসবের পাঠকও সমালোচনা সাহিত্যের পাঠকের চাইতে ভিন্ন।

আসলে সমালোচনা-লিখনের কোন সর্বজন স্বীকৃত, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গড়ে উঠেনি এখনও। মূলতঃ বিশেষ বিশেষ মাধ্যমের সুবিধা অনুযায়ী এবং পাঠকরুচির টানাপোড়েনে এ লিখনের একটি ধারা নিজস্ব রূপ নিয়ে গড়ে উঠছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু ধারা গড়ে উঠে গেছেও। পত্রিকার স্থান (Space), পাঠকদের সাময়িক-চাহিদা, কিংবা বৈদুতিন বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমের নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী সমালোচনা-লিখনের পদ্ধতিটি গড়ে উঠেছে; লেখকের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়। অর্থাৎ, যে মাধ্যমটির জন্য এ রচনাটি লেখা হচ্ছে, সে মাধ্যমটিই নিরূপণ করে দিচ্ছে এ রচনার পদ্ধতি প্রকরণ। লেখককে কী লিখব স্থির করার আগেই স্থির করে নিতে হবে কোথায় লিখব, অর্থাৎ রচনাটি কোথায় প্রকাশিত হবে। কারণ লেখকের ইচ্ছা নয়, প্রকাশের মাধ্যমই নির্ধারণ করবে রচনার পরিসর ও ব্যাপ্তি, ভাষা প্রয়োগ ও বিশ্লেষণের ধারা।

সমালোচনা-লিখনে প্রতিটি মাধ্যমের ভাষাই ভিন্ন ভিন্ন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভাষা মুদ্রিত-মাধ্যম (প্রিন্ট-মিডিয়া) থেকে ভিন্ন; সৃজনশীল রচনার সমালোচনা গবেষণাধর্মী রচনা থেকে আলাদা; নাট্যসমালোচনা কবিতা-বই এর সমালোচনা থেকে ভিন্ন। এখানে সমালোচককে নাটকের বই এর আলোচনাই করলে হবে না, এর মঞ্চায়নের প্রয়োগিক দিকও তার আলোচনায় আসতে হবে। আবার শুধু মঞ্চনাটক দেখেই, মূল পাঠটির (text) প্রতি মনোযোগী না হয়ে সার্থক নাট্য সমালোচক হওয়া অসম্ভব। সংগীত সমালোচকের জন্য গানের তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগিক উভয়দিক সম্বন্ধেই সচেতনতা প্রয়োজন। চিত্রকলা-সমালোচকের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। চলচ্চিত্র সমালোচককে নিজে পরিচালক হবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ মাধ্যমটির খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে তাঁর একটা ভালো ধারণা থাকা আবশ্যক।

তবে এক্ষেত্রে সব সময়ই যে একটি নির্দিষ্ট নিয়মই রয়েছে তা নয়। কে কোন ধরনের সমালোচনা লিখনের অধিকারী আর কে নন, তা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, অপ্রয়োজনীয়ও। আমরা প্রায়ই দেখি প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক শিল্পকলা-প্রদর্শনীর প্রতিবেদন লিখছেন; বিশিষ্ট কবি সমালোচনা করছেন কোষগ্রন্থ বা অভিধান; দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদক রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করছেন; খ্যাতিমান গবেষক-প্রাবন্ধিক সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার কড়া সমালোচনা করছেন (স্মর্তব্য, 'পরিচয়ে' অশোক রুদ্রের 'চারুলতা' সমালোচনা)।

তবে সমালোচনা-লেখকদের সচেতন থাকা প্রয়োজন, পাঠক বা বোদ্ধাজন যেন কখনওই লেখকের বিরুদ্ধে সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলার সুযোগ না পান। কবিতা লিখতে হলে কাব্যতত্ত্ব না জানলেও চলে, কিন্তু কাব্য-সমালোচক এ দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না; সুকণ্ঠ সুউচ্চারণ-তালমাত্রা জ্ঞানের অধিকারী হলেই গায়ক বা গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, কিন্তু সংগীত-সমালোচকের চাই আরো অনেক কিছু, অন্যকিছুও, নিজের গলার সুর না থাকলেও ক্ষতি নেই।

সমালোচক হতে হলে কোন ডিগ্রি, ডিপ্লোমা কিছুরই আবশ্যকতা নেই; থাকলে ভালো, না-থাকলেও ক্ষতি নেই। তবে রচনাটি যথাযথ হওয়া চাই। সমালোচককে যে ক'টি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা হল :

- সমালোচনা যেন আক্রমণের নামান্তর না হয়। লেখক/শিল্পীর দোষ ত্রুটি খুঁজে খুঁজে পাঠকদের সামনে পরিবেশন সমালোচনার লক্ষ্য নয়।
- কাউকে অহেতুক আক্রমণ যেমন সমালোচনার উদ্দেশ্য নয়, তেমনি অহেতুক প্রশংসা বাক্যে রচনাটি পূর্ণ করে দেওয়াও সমালোচনা নয়। নিন্দার মতো চাটুকারিতাও সমালোচনায় বর্জনীয়– তা সে লেখক/শিল্পী সর্বজন স্বীকৃত খ্যাতিমান ব্যক্তিই হোন্, বা সমালোচকের ঘনিষ্ঠ পরিচিত কেউই হোন্ না কেন।
- সাহিত্য-শিল্প-সংগীত বা মিডিয়া বিষয়ে নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন সমালোচনা বা প্রতিবেদনে কখনই কাঙ্ক্ষিত নয়। পাঠকরা মূল রচনা/চিত্রকলা/সিনেমা/নাটক/গান সম্বন্ধেই জানতে চান, সমালোচকের জ্ঞান কতটুকু, তা নয়। এ বিষয়ে সুকুমার রায়ই নির্ভরযোগ্য পথ প্রদর্শক। তাঁর পরামর্শটি কৌতূহল উদ্দীপক : "বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ঐখেনে দাও দাঁড়ি/হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি।"
- সমালোচক সব সময়ই নিজেকে রাখবেন দূরত্বে। তাঁর দৃষ্টি হবে নিরপেক্ষ, বিশ্লেষণ হবে নিরাবেগ।
- কী, কীভাবে এবং কেন, এ তিনটি শব্দই হবে সমালোচকের Key-words।
- যে পত্রিকাটির জন্য সমালোচনাটি লিখিত, এর পরিসরের কথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে। ঠিক যতটুকু স্থান সমালোচনার জন্য বরাদ্দ থাকে, লিখতে হবে ঠিক ততটুকুই; প্রয়োজনে শব্দ গুনে গুনেও।
- টার্গেট রিডারের কথাটি সব সময়ই মনে রাখতে হবে। সংবাদপত্রের ক্রোড়পত্র অংশটির পাঠক আর Edit page-এর পাঠক এক নাও হতে পারেন, সংবাদ-প্রতিবেদন-পাঠকের প্রত্যাশা ও মানসিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে, এটা মনে রাখতেই হবে।
- সমালোচনার ভাষা সবসময়ই স্বচ্ছ, অলঙ্কার-বর্জিত, কটাক্ষ-শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বর্জিত এবং ক্লিশে মুক্ত হওয়া কাম্য।

সমালোচনা লিখতে হলে . . .

সংবাদপত্র, সাহিত্য-সাময়িকী, লিট্‌ল ম্যাগাজিন, কিংবা নিউজ-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সমস্ত সমালোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সাম্প্রতিক সমালোচনার আঙ্গিক ও স্টাইল সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'জিজ্ঞাসা', 'অমৃতলোক', 'অনুষ্টুপ', 'সাহিত্য', 'একা এবং কয়েকজন', 'পূর্বদেশ' প্রভৃতি পত্রিকায় শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি-চারুকলা ইত্যাদি প্রায় সব বিভাগই সমালোচনায় স্থান পায় (এ তালিকা অনেক দীর্ঘায়ত করা হয়, এ প্রসঙ্গে এর আর প্রয়োজন নেই)। সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় 'আনন্দবাজার', 'আজকাল' কিংবা বিভিন্ন প্রাদেশিক, আঞ্চলিক ও জেলাস্তরের সংবাদপত্রের সাপ্তাহিকীতে, ক্রোড়পত্রে এবং সাধারণ সংখ্যায়ও। ইংরেজি নিউজ ম্যাগাজিন, রিসার্চ জার্নাল– India Today, Economic and Political Weekly এর কয়েকটি পৃষ্ঠায় অতি উন্নতমানের সমালোচনা (বিশেষত Book Review) থাকে, এগুলোকে একেবারে Text হিসেবেই গ্রহণ করা যায়। The Statesman, The Telegraph, Times of India প্রভৃতি কাগজের শিল্প-কলা-সংগীত কিংবা সাহিত্য-সংস্কৃতি-সিনেমা-নাটক সমালোচনা নির্ভরযোগ্য পাঠ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ইংরেজি হোক্, বাংলা হোক্, অসমিয়াই হোক্, উন্নতমানের সব ধরনের, সব ভাষার সমালোচনা পড়েই লেখককে তৈরি হতে হবে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত Times Literary Suppliment সম্ভবত গ্রন্থ-সমালোচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পত্রিকা। এর সংখ্যাগুলো সংগ্রহ করা কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় ও শ্রমসাপেক্ষ হলেও খুব কঠিন নয়। আজকাল ইন্টারনেটে এসব একেবারে সহজলভ্য।

স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রায়শই যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়, এর মধ্যে নির্ভরযোগ্য রচনা অতি অবশ্যই থাকে, কিন্তু এখান থেকে পাঠ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। পাঠ নিতে হলে প্রথম শ্রেণির রচনা থেকে এবং প্রথম শ্রেণির পত্র-পত্রিকা থেকেই নেওয়া উচিত।

সমালোচনার নামে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর একেবারে মধ্যভাগ পর্যন্ত একটি ধারণা ছিল যে সমালোচনা মানেই শাসন, উপদেশ এবং ভর্ৎসনা। সমালোচিত ব্যক্তি যে একজন নিরেট মূর্খ, অসাবধানী, অসচেতন– এটা তাঁকে জানিয়ে দেওয়াটাই সমালোচকদের যেন মুখ্য কর্ম ছিল। প্রাক্-রবীন্দ্র এবং রবীন্দ্রযুগের পত্র পত্রিকার সমালোচনাগুলো ছিল বড় তীর্যক, ভীতি উদ্রেককারী। এ প্রথাটি ইংরেজি সাহিত্যেও প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে ক্রিটিকদের (critic) ভয়ে তটস্থ থাকতেন লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, নাট্যকার। কবি কিটস্‌কে কম্পাউন্ডারি করার পরামর্শ প্রদান, ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিন

বেঁচে রয়েছেন (স্মর্তব্য, H. Coleridge* এর ব্যঙ্গ কবিতার পংক্তি He dwells among the untrodden ways ..... A bard whom there is none to praise and very few to read), উইলিয়াম কংগ্রিভ ও তাঁর সমসাময়িকগণ যে উজবুকদের জন্য নাটক লিখছেন (Comedy of Manners সম্বন্ধে Dr. Johnson লিখেছিলেন যে এসব নাটক রচিত হয়েছে by the blackguards, for the balckguards and with the blackguards)– এসব কথা তাঁদের জানিয়ে দেওয়াটা সমালোচকরা নিজেদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য মনে করতেন।

বাংলা সাহিত্যে সজনীকান্ত দাস, সুরেশ সমাজপতি, ডি.এল. রায় এবং তাঁদের সঙ্গীদের রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনাও ছিল ওই পর্যায়ের। কবিগুরুর 'সোনার তরী' কবিতাটির সমালোচনায় ডি.এল. রায় কতকগুলো তথ্যগত ভ্রান্তি (factual error) দেখিয়ে উল্লাস করেছিলেন (দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃঃ ৮৪০-৮৪৪)। কবিতায় 'পরপারে দেখি আঁকা/তরুছায়া মসীমাখা/গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলায়...'এ পংক্তিগুলোর মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাধারণ জ্ঞানের ঘাটতি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। মেঘে ঢাকা গ্রামে, তাও আবার 'প্রভাত বেলায়' যে 'তরুছায়া' দেখা যায় না, এটা অতি অবশ্যই খাঁটি কথা। এ সঙ্গে অবশ্য সমালোচক কবিতার বিষয়বস্তু (কবির চাষী একবারেই বিষয়ী ছিল না), ভাষা, অলঙ্কার ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাটিকে একেবারে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু এ কবিতাটি আজও প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালির স্মৃতিতে অমলিন।

'ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা' গানের রচয়িতা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সমালোচক হিসেবে নিজেকে সংযত রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন, কবিগুরুর কবিতার মর্মমূলে যাবার চেষ্টাই করেননি (যখন তিনি সমালোচকের টেবিলে বসেছেন)। তাই অনায়াসে ব্যঙ্গ করে লিখতে পারলেন– 'এখনও তারে চোখে দেখিনি/শুধু কাব্য পড়েছি/অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে বসেছি।'

এধরনের সমালোচকদের জন্য ইংরেজিতে একটি শব্দগুচ্ছ প্রচলিত আছে, Blood thirsty Reviewer; এদের সম্বন্ধে জার্মান দার্শনিক নিটসে (Nietzsche) বলেছেন, '.... They desire the author's blood, not their pain'। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ কয়েকটি উজ্জ্বল পঙক্তি আমাদের জন্য রেখে গেছেন, যা আমরা এখানে উদ্ধার করব :

সমারূঢ়

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা'–
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়– সে যে আরূঢ় ভনিতা;
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের'পর

---

* এঁকে কবি বন্ধু সেমুয়েল টেলর কোল্‌রিজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না, ইনি হার্টলি কোল্‌রিজ।

ব'সে আছে সিংহাসনে– কবি নয়– অজর, অক্ষর
অধ্যাপক; দাঁত নেই– চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে– আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিল– হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতকে মনে রেখে আমরা কয়েকটি বিশেষ সমালোচনা লিখনের উপর আলোকপাত করব একে একে :

গ্রন্থ-সমালোচনা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রতিটি সংবাদপত্র, সাহিত্য-পত্র বা সাময়িকীর কয়েকটি পৃষ্ঠা, গ্রন্থ-সমালোচনা, কিংবা ইংরেজিতে 'বুক রিভিউ'-এর জন্য নির্দিষ্ট থাকে। আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে, দূরদর্শনের Educational Programme (U.G.C. IGNOUর ব্যবস্থাপনায়) এগুলোতেও গ্রন্থ সমালোচনা হয়ে থাকে। সাধারণ পাঠক থেকে গ্রন্থ-সমালোচক বা বুক রিভিউয়ার হয়ে উঠতে হলে এসব সমালোচনা পড়া এবং অনুষ্ঠানগুলোর খবরাখবর রাখাও আবশ্যক। রেডিওর গ্রন্থ সমালোচনার জন্য B.B.C.র The Good Book অনুষ্ঠানটি একটি নির্ভরযোগ্য মডেল [B.B.C. প্রোগ্রাম গাইড, London Calling বিনামূল্যেই পাওয়া যেত, সম্প্রতি এটা বন্ধ করে দিয়েছেন ওরা]।

সাধারণতঃ একটি সমালোচনা ছ'শ থেকে সাত'শ শব্দসীমার মধ্যেই হয়ে থাকে। তবে সম্পাদক কর্তৃক অনুরুদ্ধ সমালোচক (Commissioned Reviewer) মাঝে মাঝে অতি দীর্ঘ রচনাই লিখে ফেলেন, যা স্বতন্ত্র নিবন্ধের মর্যাদাই দাবি করে। 'দেশ' কিংবা India Today পত্রিকায়ও গুরুত্ব বিবেচনা রিভিউ দীর্ঘ হয় প্রায়শই। তবে সাধারণতঃ গ্রন্থসমালোচনা বা রিভিউ-এর পরিসর একেবারে মাপাই থাকে, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে।

সার্থক গ্রন্থসমালোচনায় তিনটি দিকে লেখকের মনোযোগ লক্ষ করা যায়– একটি চমৎকার, চিত্তাকর্ষক শুরু, মধ্যিখানে সুসংবদ্ধ যুক্তি এবং বিশ্লেষণ, আর একটি অর্থবহ, ইঙ্গিতবহ, চিন্তা জাগানিয়া সমাপ্তি।

রিভিউ মূল বইয়ের সারাংশ নয়, 'বোধিনী'ও নয়। এর লক্ষ্য পাঠকদের কৌতূহলকে উস্‌কে দেওয়া, রচনাটির অভিনবত্ব, সাম্প্রতিকতা বা সর্বকালীন গুরুত্ব নির্ধারণ করে, অপরাপর গ্রন্থ সমূহের সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনা করে সাহিত্য বা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার জগতে রচনাটির মূল্যায়ন।

বৌদ্ধিক সততা গ্রন্থসমালোচকের জন্য একান্তই অবশ্যক। রিভিউয়ারকে আলোচিত বইটি নিজেই পড়তে হবে, কোন পরোক্ষ জ্ঞান, মলাট-লিখনের (blurb) উপর

নির্ভর করেই লিখে নেওয়া চলবে না। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে 'Show you acquaintance with....' বা 'টীকা লিখ' এ ধরনের রচনার প্রশিক্ষণ নিয়ে এক বিরাট সংখ্যক লেখকের পরোক্ষ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থ সমালোচনা বা বুক রিভিউ-এর হাতেখড়ি হয়ে চলেছে, এটা দুর্ভাগ্যজনকই।

বিশিষ্ট লেখকদের বন্দনা অর্থাৎ Hero Worshipping গ্রন্থসমালোচকের কর্ম নয়। ব্যক্তি নয়, বিষয়ই সমালোচকের মুখ্য বিবেচ্য।

ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ, ভাষিক অভিমান, স্বাজাত্যাভিমানকেও অতিক্রম না করলে গ্রন্থ সমালোচনা যথেষ্ট দুরূহ কাজই হবে।

গ্রন্থ-সমালোচনায় অতিপ্রয়োজনীয় প্রাথমিক যে কাজগুলো আবশ্যক তা নিম্নরূপ :

১. প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার অনুসন্ধান অর্থাৎ Library Work বা Home Work, আলোচ্য বইয়ের লেখকের অপরাপর রচনা, তাঁর উপর বিশেষজ্ঞদের অভিমত, পাঠক-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি যাচাই করে নেওয়া;

২. বিষয় ভিত্তিক প্রাথমিক জ্ঞানটুকু অর্জন করে নেওয়া, পরিভাষার সঠিক পাঠ রপ্ত করা;

৩. নিজেকে একটু নৈর্ব্যক্তিক স্তরে স্থাপন করা, অর্থাৎ একটি unbiased বা objective দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা;

৪. নিজস্ব আবেগ, উচ্ছ্বাস, কল্পনা-প্রবণতাকে সংহত করে নেওয়া; প্রশংসা এবং সমালোচনা (criticism) উভয় ক্ষেত্রেই বাক্-সংযম আয়ত্ত করা; তবে প্রয়োজনে প্রশংসা না করাটাও রিভিউয়ারের ব্যর্থতা, একথাটি মনে রাখতে হবে।

বাণিজ্যিক বা প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকার নিজস্ব Review Editor থাকেন; সমালোচনার জন্য গৃহীত বই এবং সমালোচক নির্বাচনটিও থাকে এদের হাতে। তবে নিজস্ব প্রয়াসে কোনও সমালোচক মূল বই-এর একটি কপিসহ রিভিউ লিখে পাঠিয়ে দিলে তাও প্রকাশিত হয় যদি রিভিউ-সম্পাদক অনুমোদন করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা অনিশ্চিতির ব্যাপার থেকেই যায়, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাণিজ্যিক প্রকাশনার ক্ষেত্রে। আবার স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, লিট্‌ল ম্যাগাজিনে রিভিউ পাঠালে এবং তা-যদি নির্দিষ্ট পত্রিকার মান অনুযায়ী হয়, তা সানন্দেই গৃহীত হয়। তবে এক্ষেত্রে সাম্মানিক পাবার স্থিরতা থাকে না। অধিকন্তু মূল বইটি সম্পাদকের দপ্তরে নিজ খরচায় পাঠাতে হবে, বইটির মূল্যও অনেক সময় সমালোচককে নিজেই বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে সম্পাদকের দপ্তরে মূল বইয়ের প্রচ্ছদের একটি ফটো-কপি পাঠিয়ে দেওয়াই বোধ হয় সঙ্গত। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির প্রতি লেখক সম্পাদক প্রকাশকের নজর দেবার খুবই প্রয়োজন।

গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা :

- সমালোচনার জন্য নতুন বই'ই গ্রহণ করতে হবে।
- পুরাতন বিখ্যাত বইয়ের নতুন সংস্করণকে গ্রহণ করা যায়, যদি এর মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন বা সম্পাদকীয় সংযোজন থাকে এবং বইটির সাম্প্রতিক-প্রাসঙ্গিকতা (contemporary relevance) থাকে।
- ছাত্র-পাঠ্য বই এবং একেবারে সাধারণ মাপের ব্যবহারিক বই সমালোচনার জন্য বিবেচিত হয় না।
- গ্রন্থ সমালোচনায় যে সমস্ত দিকে নজর রাখা একান্ত আবশ্যক তা হল–
  বইটি কা'র, অর্থাৎ লেখকের না সম্পাদকের (outhor's book না editor's book) এটা মনে রেখেই সমালোচনা করা।
- বইয়ের আঙ্গিক (Format) প্রচ্ছদ, বাঁধাই, মুদ্রণ
- বিষয়বস্তু
- ভাষা, স্টাইল, বানান এবং ক্যালিগ্রাফ, ইলাস্ট্রেশন
- টার্গেট রিডার
- সাহিত্য/জ্ঞান বিজ্ঞান/বিদ্যাচর্চার জগতে বইটির অবস্থান
- লেখক সম্পর্কে অতি-প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ
- লেখক তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন কি না
- প্রকাশক, পরিবেশক এবং বইটির মূল্য।

সমালোচক যেন কখনই বইটি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবার অভিপ্রায় না করেন, এটাও মনে রাখতে হবে। পাঠককে সরাসরি জানিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই যে, বইটি কিনলে তিনি আখেরে ঠকবেন (এ ধরনের বইয়ের রিভিউ এর প্রয়োজন নেই), অথবা বইটি সংগ্রহ না করলে তাঁকে পস্তাতে হবে। শেষ সিদ্ধান্তটি নিজের কাছে জমা রাখাটাই ভালো– অর্থাৎ, রিভিউ-এর সমাপ্তিটা হবে মুক্ত, open-ending। কারণ, কোনও সৃষ্টি সম্বন্ধে শেষ কথা বলা অসম্ভব ব্যাপারই। অনেক বিরূপ-সমালোচিত বই কালের বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছে, আর বহু-ঢক্কা-নিনাদিত গ্রন্থই সম্বৎসরের মধ্যে বিস্মৃতিতে তলিয়েও গেছে।

কয়েকটি রিভিউ পর্যলোচনা :

এ পর্বে আমরা কয়েকটি সমালোচনা-লিখনকে উপজীব্য করে গ্রন্থ/পত্রিকা সমালোচনার কয়েকটি অনুসরণযোগ্য রীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

এক ঃ কবি প্রাবন্ধিক গবেষক শঙ্খ ঘোষ তার 'উর্বশীর হাসি' বইতে 'কোষবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামায় একটি রচনা রেখেছেন যেখানে রবীন্দ্র বিষয়ক বেশ কয়েকটি বই, কোষগ্রন্থ, তথ্যপঞ্জির উপর একটি বিশ্লেষণ-ধর্মী আলোচনা আছে। এ আলোচনার মধ্যে

সার্থক রিভিউ-লিখনের অনেক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। আমরা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত মূল বইটির সমালোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করছি–

> কে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ভারতকোষ? অযোগ্য কেউ কি? রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনভিজ্ঞ কেউ? সে কথা বলার উপায় নেই কোনো। রবীন্দ্রজীবনীর যে কোন তথ্য বিষয়ে সব সময়েই যাঁর দুয়ারে যেতে হয় আমাদের, সেই প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ই এর লেখক। এটা ঠিক যে অনুমান নির্ভরতা 'রবীন্দ্রজীবনী'তেও কখনো কখনো আত্মপ্রকাশ করে বসে.... কিন্তু অমূল্য সেই চারখণ্ড জীবনীর ব্যাপক বিস্তারের মধ্যে তার একটা জায়গা হয়ে যায় হয়তো। সংক্ষিপ্ত এই তথ্যপরিসরেও তার প্রয়োগ কি ঠিক? প্রকাশকাল আর রচনাকালের ভিন্নতা বিষয়ে আরো একটু অবধান কি আশা করা যায় না এখানে?.... আর সবচেয়ে বড়ো কথা, কোন শিথিলতম মুহূর্তেও কি প্রভাত কুমারের মতো নিরলস গবেষকের কলম থেকে পৌঁছতে পারে এই সংবাদ যে সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ছিলেন প্রতিভা? মুদ্রণপ্রমাদ?
>
> মনে হয়, সমস্যাটা অন্যত্র। এই ভারতকোষ পরিকল্পনার প্রথম এক পর্বে দেশের মাননীয় কোন মনীষী ক্ষোভ করে বলেছিলেন যে এদেশে কোন বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ নেই কোনো, কোনো বিষয়েরই উৎসুক পাঠক নেই কোনো।.... কিন্তু না, কথা দুটি ভুল।
>
> শহরের অলিতে গলিতে মফঃস্বলে গঞ্জে-বাজারে আজও আছেন এক এক সশ্রদ্ধ একাকী উন্মুখ পাঠক, যাঁরা পরম নিষ্ঠায় আর আগ্রহে জানতে চান সহস্র বিষয়। তাঁদের উপেক্ষা করবার কোন অধিকার আছে কি লেখকদের? তাঁদের কথা মনে থাকে না বলেই জ্ঞানী মানুষদেরও এমন বিপর্যয় হয়। জ্ঞানীরা তখন ভুলে যান তাঁদের যে-কোন বয়সের লেখা প্রতিটি রচনার প্রতিটি লাইন ছুটে যাচ্ছে সেই অজ্ঞাত নিরীহ জিজ্ঞাসু একাকী মানুষগুলির দিকে। আর ভুলে যান বলেই তার থেকে তৈরি হয় এমন এক মানসিক ক্লৈব্য যার থেকে যে কোনো-রকম অসম্ভব পরিকল্পনা অনায়াসে চলে আসে কলমের মুখে তথ্য হিসেবে। ভুল করাটা ভয়ের নয়, ভুল আমরা সকলেই করি, কিন্তু যে-ভুলের জন্ম পাঠকের প্রতি নিদারুণ ঔদাসীন্য আর উপেক্ষা থেকে, প্রতিষ্ঠার শিখরে থেকে অনায়াস অবহেলার যে ভুল, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই।

এ বিচ্ছিন্ন অংশটিতে আমরা দেখেছি সমালোচক সর্বজন স্বীকৃত, বন্দিত রবীন্দ্র জীবনীকারের কয়েকটি তথ্যগত ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু এটা তাঁর সদম্ভ-আবিষ্কার নয়। এই সংযম পালন করতে পারেন শঙ্খ ঘোষই। এবং এজন্যই তিনি সত্যনিষ্ঠ, তথ্যনিষ্ঠ এবং আপাদমস্তক আধুনিক।

আবার, দ্বিতীয়ত, যে-ভ্রান্তির প্রতি লেখক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, তা যে রবীন্দ্রচর্চায় কত বড় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, বিশৃঙ্খলা জাগাতে পারে, তাও জানিয়েছেন, কিন্তু শব্দ ব্যবহারে তিনি একেবারে নিরাবেগ, নিরুত্তাপ এবং মার্জিত।

তৃতীয়ত, সমালোচক হিসেবে শঙ্খ ঘোষ পাঠকদের প্রতিনিধিত্বও করছেন; প্রথানুগ গবেষক, পণ্ডিত বা তথ্যের কারবারি না হয়েও যে দেশে কৌতূহলী পাঠক রয়েছেন, এদের প্রতি লেখকদের যে সম্ভ্রমবোধ থাকা কর্তব্য, এ-কথাটি কত বিনম্র চিত্তে (কোন Humour বা Ironyর সাহায্য ছাড়াই।) লেখক জানিয়ে দিলেন। এ পরিস্থিতিতে লেখক একটু অসংযমী হলেই প্রভাত কুমার মুখোমাধ্যায়কে উপদেশ বাক্যে জর্জরিত করে ফেলতেন। শঙ্খ ঘোষের এ রচনায় যে তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ছে তা হল, পরিমিতি বোধ, শৃঙ্খলাবোধ আর বাক্-সংযম।

দুই : বই এর নাম 'সঞ্চয়িতা', সমালোচক (রিভিউয়ার) প্রবোধচন্দ্র সেন। রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার নবমবর্ষের একটি সংখ্যায় (মীনাক্ষী দত্ত সংকলিত, সংকলন—২, কলিকাতা-১৯, পৃঃ ৩৮-৪০ দ্রষ্টব্য)।

রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'র পঞ্চম মুদ্রণের চতুর্থ সংস্করণটির এ সমালোচনায় লেখক কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য তুলে ধরেছেন, তা হল :

(ক) সঞ্চয়িতার প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে; কবিগুরুর জীবনকালে আরো দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৪০, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে), এবং এতে কবি প্রচুর বর্জন এবং গ্রহণও করেছেন; কিন্তু,

(খ) আলোচ্য সংস্করণে 'আয়তন বৃদ্ধির ভয়ে নিরস্ত না হয়ে পূর্ববর্তী সংস্করণে কবি-নির্বাচিত সব কবিতাই রক্ষা করা হয়েছে, খণ্ডিত অংশগুলিও যথাস্থানে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে' এবং 'স্বনির্বাচিত মর্যাদার গৌরবচিহ্নিত সমস্ত কবিতা এই সংস্করণেই সর্বপ্রথম সমগ্ররূপে প্রকাশিত হল' একথাটিও আমরা জানলাম।

(গ) সংকলনে ৩৫৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে; সংযোজন বিভাগে কবির ষোলোখানি পুস্তক থেকে ৮২টি কবিতা রাখা হয়েছে; গীতবিতান থেকে রয়েছে ৩২টি গান।

সংকলন গ্রন্থটির সম্পাদকীয় অংশে এসব তথ্য এবং পরিসংখ্যান থাকায় যে বইটি নিছক একটি 'সঞ্চয়ন পুস্তক মাত্র' না থেকে হয়ে উঠেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য আকরগ্রন্থও, এ কথাটিও রিভিউ-তে ব্যক্ত হয়েছে।

'সঞ্চয়িতা'র মত সংকলন গ্রন্থ-প্রকাশ সব সময়ই প্রশংসনীয় প্রয়াস, কিন্তু এর অন্য দিকটির কথাও সমালোচক বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'সঞ্চয়িতা ও চয়নিকা, এই দুখানি বই সহজপ্রাপ্য হওয়াতে পাঠক-সমাজে রবীন্দ্রনাথের মূল গ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি কমে গিয়েছে সন্দেহ নেই।' এটা অতীব খাঁটি কথা, ক'জন পাঠক বা

রবীন্দ্রভক্ত কবিগুরুর বাহান্নটি কাব্যগ্রন্থের নাম জানেন বা বইগুলো চোখে দেখেছেন? শিক্ষিত বাঙালির কাছে রবীন্দ্রকাব্য আর 'সঞ্চয়িতা' যে প্রায় সমার্থক হতে চলেছে।

প্রবোধচন্দ্র সংকলনের কিছু টেকনিক্যাল দোষ ত্রুটি দেখিয়েছেন এবং এ কথাটিও বলেছেন "'ভালো হত আরো ভালো হলে' এ অনুভূতি যে কখনই নিরস্ত হবার নয়।" সমাপ্তিতে বইটির মূল্য সম্বন্ধেও একটি বাক্য বলতে ভুলেননি– 'দশ টাকা মূল্য হওয়া সত্ত্বেও ..... রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক মাত্রই একখণ্ড পুস্তক সংগ্রহে প্রলুব্ধ হবেন সন্দেহ নেই।' তৎকালীন অর্থনীতির নিরিখে 'দশ টাকা মূল্য হওয়া সত্ত্বেও' কথাটি যথেষ্ট ব্যঞ্জনাধর্মী।

তিন : সুজিৎ চৌধুরী লিখিত একটি ক্ষুদ্র-কলেবর পুস্তিকা, যেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ, বহু-প্রচলিত, বহু-পঠিত 'স্মারকগ্রন্থে' সংকলিত বেশ কয়েকটি নিবন্ধের সমালোচনা রয়েছে, আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানব এ পুস্তিকার উপর আলোচনা করেই। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাটির নাম 'বরাক উপত্যকা প্রসঙ্গে : সত্য ও তথ্য' (করিমগঞ্জ, ১৯৮৮, আসাম)।

আসাম রাজ্যের অবিভক্ত কাছাড় জেলার হাইলাকান্দিতে 'অসম সাহিত্য সভার' ৫৪তম অধিবেশন উপলক্ষে প্রকাশিত এ স্মারক গ্রন্থ এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বরাক-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে মিলন-সেতু গড়ে তোলার যে সমস্ত পরিকল্পনা বিজ্ঞাপিত হয়েছিল তা যে 'একান্তই বাহ্যিক আবরণ মাত্র' এবং যে 'আবরণের অন্তরালে লুক্কায়িত রয়েছে সাংস্কৃতিক ও ভাষিক আগ্রাসনের এক সযত্নরচিত পরিকল্পনা'– সমস্ত রচনা পড়ে, বিশ্লেষণ করেই লেখক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ কর্মে তিনি কতটা নিরাবেগ থাকতে পেরেছেন, নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করতে পেরেছেন, কিংবা কোথায় হঠাৎই তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ গবেষক-সত্তাকে ছাপিয়ে লেখকের ভাষিক অভিমান উঁকি দিতে চেয়েছে– এ'ই আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য। বলা বাহুল্য লেখককে গৌরবান্বিত করা বা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করা, কোনটাই বর্তমান লেখকের অভিপ্রেত নয়, এখানে textual বিশ্লেষণই মুখ্য।

স্মারক গ্রন্থের প্রায় সব ক'টি নিবন্ধেই একটি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ছিল, তা হল, বরাক উপত্যকায় প্রচলিত বাংলা উপভাষাটি (dialect) বাংলা নয়, অসমিয়া। সুজিৎ চৌধুরী এ তত্ত্বটি অস্বীকার করেছেন তথ্য, যুক্তি এবং তত্ত্ব দ্বারাই; এবং এরকম তত্ত্ব-প্রচারের উদ্দেশ্য যে মহৎ নয়, তাও বলেছেন।

প্রথম নিবন্ধটি যে মন্ত্রী লিখেছেন, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, শিক্ষা-নীতি ইত্যাদি বিষয়ে শ্রী চৌধুরী যে তাঁর চাইতে অনেক শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, অতি-সত্য এ কথাটি সুজিৎবাবু কোথাও উচ্চারণ করেননি। অর্থাৎ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেননি। মন্ত্রী বলেন '.... (বরাক উপত্যকার) শিশুরা যখন স্কুলে যায় তখন শুরুতেই তাকে যে ভাষাটি শিখতে হয়, সেটা সম্পূর্ণরূপে তার ঘরে ব্যবহার করা মাতৃভাষা নয়। ফলে তাকে একটা নতুন ভাষা শিখতে হয়.....। এই জন্যেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষায় ভালো ফল করতে পারে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ে না।' এত নির্জলা মিথ্যা এবং ভ্রান্ত কথা পাঠ করে ক্রোধ

জেগে ওঠা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সুজিৎ চৌধুরীর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত– '.....-র সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের মতো জটিল বিষয় নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া পণ্ডশ্রম এবং বিড়ম্বনা মাত্র'। পরবর্তী একটি মাত্র প্যারাগ্রাফেই লেখক ভাষা এবং উপভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা করে তথ্য-সহ অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করেই কলম উঠিয়ে নেন।

এখানে দু-একটা যুৎসই বিশেষণ লাগিয়ে মন্ত্রীমশাই যে একেবারে অনধিকার চর্চা করছেন, (তা-ও আবার সাহিত্য সভার স্মারক গ্রন্থে) ইত্যাকার কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করলে উত্তেজনাপিপাসু পাঠক হয়তো বা খুবই তৃপ্ত হতেন, কিন্তু সুজিৎ চৌধুরীর পাণ্ডিত্য এবং রুচির কাছে তা হত গর্হিত কর্ম।

স্থানীয় আরো দুজন অধ্যাপকও যখন নিজ মাতৃভাষার বিরুদ্ধে এরকম সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন (একজন তো লজ্জার মাথা খেয়ে লিখেই বসলেন 'অসমীয়া, কাছাড়ী, সিলেটি মূলতঃ একই ভাষা') তখন স্বভাবতঃই আহত পাঠক আশা করেছিলেন যে সুজিৎ চৌধুরী এদের ভাষাদ্রোহী বা আর কিছু একটা বলবেন। কিন্তু তিনি রইলেন নীরব, কিন্তু এ নীরবতা যে কতটা বাঙ্ময় তা যাঁদের বিভ্রান্তি তিনি দেখিয়ে দিলেন, তাঁরাই অনেক অনেক দিন উপলব্ধি করবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে উচ্চকণ্ঠ যেখানে অনিবার্য সেখানে দু-একটি তির্যক উল্কাপিণ্ডের মতো শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করে আচমকা তপোধীর ভট্টাচার্য আশ্রয় নেন জীবনানন্দে : যারা বলে 'বরাক উপত্যকার ভাষা বাংলা নয় অসমিয়া' এদের উদ্দেশ্যে তিনি ছুঁড়ে দেন দু'টি পঙক্তি: 'আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে।' ("প্রসঙ্গ : বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতা", স্মরণিকা, ১১তম সম্মেলন, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর, ১৯৯১)

আরেকজন লেখিকা বললেন, 'শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলায় বাংলা শব্দের সঙ্গে অসমীয়া শব্দের অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। এই শব্দগুলো পশ্চিমবঙ্গের বাংলা শব্দের চাইতে আলাদা' ইত্যাদি ইত্যাদি; অর্থাৎ ইনিও বরাক উপত্যকার বাঙালিরা যে বাঙালি নয়, তা প্রমাণ করতে বসেছেন। কাছাড়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ইতিহাস প্রসঙ্গে এসে তিনি বলেন, 'ডিমাসা-কাছাড়ীদের রাজসভার সরকারী ভাষা ছিল অসমীয়া'; কিন্তু এর প্রমাণ হিসেবে ১৬৮৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে ডিমাসা-রাজদরবার প্রদত্ত একটি দানপত্র তুলে দিয়ে হঠাৎই বলে ফেললেন, 'সনন্দের ভাষা শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় প্রচলিত গ্রাম অঞ্চলের বাংলা বয়ান।' অতি সাধারণ একজন ইতিহাসের ছাত্রও লেখিকাকে এ পরিস্থিতিতে কী ভয়ঙ্করই না আক্রমণ করতে পারত, কিন্তু ইতিহাসের নিবিড় পাঠক সুজিৎ চৌধুরী এবারও সুযোগটির সদ্ব্যবহার করলেন না, শুধু ভুলটি দেখিয়ে দিলেন।

ডিমাসা রাজসভার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি বিরচিত 'শ্রী নারদি রসামৃত' (১৭০২-১৭২০ খ্রিঃ-র মধ্যে রচিত) গ্রন্থের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্বলিত ড. প্রমোদ ভট্টাচার্যের নিবন্ধটির সমালোচনায় সুজিৎ চৌধুরী যথেষ্ট অবেগপ্লুত অথচ তীর্যক এবং সপ্রতিভ। একটি অংশ এখানে উদ্ধার করে দেওয়া হল :

ভুবনেশ্বর বাচস্পতিকে অসমীয়া কবি হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য শ্রী প্রমোদ ভট্টাচার্য স্মারক গ্রন্থে লিখেছেন : (গদ্য অংশটুকু মূল অসমিয়া থেকে অনুবাদ)– "অসমীয়া ভাষায় নেতিবাচক 'ন', 'না' ক্রিয়াপদের আগে বসার নিয়ম কাছাড়ী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় রক্ষিত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ভুবনেশ্বর বাচস্পতির নারদীয় পুরাণের চার ছত্র তুলে দেওয়া হল :

"প্রণমহু ভূমিপতি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
বিষ্ণুর বল্লবা কামদেব জননী
ক্ষিরদ তনয়া দেবি ভকত বৎসলা
না বুঝিয়া মূঢ় লোকে বলে চঞ্চলা।" (স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ ১১১)

এখানে 'না বুঝিয়া' এই প্রয়োগটি লেখকের সিদ্ধান্তের উৎস। একথা সত্যি যে বাংলা গদ্যে নেতিবাচক 'না' সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের পরেই বসে। (ব্যতিক্রমও রয়েছে, যথা 'না বলে কয়ে চলে গেলে', 'না জেনে কথা বল না' ইত্যাদি) এবং অসমিয়ায় নেতিবাচক শব্দটি বসে ক্রিয়ার আগে। কিন্তু বাংলা কবিতায় যে নেতিবাচক 'না' ক্রিয়াপদের আগে অহরহ'ই বসে, এ খবরটি শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য নেননি। নিলে ভালো করতেন, নইলে খোদ রবীন্দ্রনাথও নেচিবাচক 'না' ক্রিয়াপদের আগে ব্যবহার করার সুবাদে সমজাতীয় সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে যাবেন। কারণ কে না জানে যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে', 'আমার না বলা বাণীর', 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়', 'নাহি নিন্দে বিধাতারে', 'না জানি কেন রে এত দিন পরে' ইত্যাদি। এমন কি যে দুটি শব্দ প্রয়োগের জন্য কাব্য রচনার আড়াইশত বৎসর পরও বাচস্পতি মশাই-এর রেহাই মিলছে না, সেই 'না বুঝিয়া' শব্দদুটিও রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন : 'না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখি জলে।' না বোঝাটা কার জানি না, আঁখি জলে অবশ্য আমরাই আজ ভাসছি।

শেষ দুটো পংক্তিতে (নিম্নরেখাটি বর্তমান লেখকের) লেখকের বিধ্বস্ত বাঙালি সত্তা, মাতৃভাষার উপর আগ্রাসনজনিত দুঃখবোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। এখানে তিনি পুরোপুরি সাবজেকটিভ (Subjective); কিন্তু তাঁর লিরিক্যাল প্রকাশভঙ্গি এ সমালোচনাটিকে (প্রচার পুস্তিকাটিকে) মুহূর্তেই একটি সৃজনশীল সাহিত্যে উন্নীত করে ফেলেছে। এবং এ জন্যই সমালোচনার একটি সৃজনশীল-পাঠ হিসেবে প্রান্তিকায়িত এ বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত ছোট্ট এ পুস্তিকাটিকে গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই– যে কোন ভাষাভাষীর যে কোন লেখকেরই।

চার : রিভিউ 'শয়তানী পদাবলি' (Satanic Verses) : যে বইটি পড়া হল না

১৯৮৮ সালে ইংলন্ড থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক সালমন রুশদির The Satanic Verses (Viking, Price £ 8.95; Pages : 547) প্রকাশিত হয় এবং সারা বিশ্বেই

সাড়া জাগিয়ে দেয়। ওই বছরের Booker Prize এর জন্যও তৎক্ষণাৎ বইটি short listed হয়ে যায়। ইউরোপ-আমেরিকার বিখ্যাত সব পত্র-পত্রিকায় বইটির রিভিউ প্রকাশিত হয় এবং ভারতের পত্র-পত্রিকায় এগুলোর পুনর্মুদ্রণও দেখা যায়। তবে এরও প্রায় মাসখানেক আগে India Today নামক নিউজ ম্যাগাজিনের Book বিভাগে একটি রিভিউ প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল An Irreverent Journey : An Unequivocal Attack on Religious Fundamentalism (সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৮৮)। এরপর অক্টোবর ৫, ৮৮ তারিখের The Statesman-এ লেখা হল– "Muslim fundamentalists are lobbying to get Salmon Rushdie's latest book, The Satanic Verses ..... banned on the ground that it has hurt the 'religious sentiments of Muslims' । হোম মিনিস্ট্রি ইতিমধ্যেই সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ (এরা কারা আমরা জানতে পারিনি)-দের দিয়ে বইটি পড়িয়েও নিয়েছেন জানা গেল– পরিণামে লাইব্রেরির তাক থেকে সবকটি বই সরে গেল, রইল শুধু কয়েকটি রিভিউ– যা পড়ে আমরা এ বই সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণাই করে যাবো, অনেকদিন, হয়তো বা অনেক অনেক বছর ধরেই।

আমরা এখানে মধু জৈন লিখিত এ-রিভিউ নিয়ে আলোচনা করে পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গের ইতি টানব।

বলে নেওয়া ভাল, India Today-র এ-রিভিউটি কোন অ্যাকাডেমিক সমালোচনা নয়, কোন সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষণ নয়, নয় কোন সাহিত্যিক মূল্যায়নও। নিতান্তই পপুলিস্ট এবং এলিটিস্ট রিভিউ এটি। এর ভাষার একটা আকর্ষণীয় ক্ষমতা আছে যা এ-ধরনের প্রিন্ট-মিডিয়ার জন্য আদর্শ। গদ্যের মধ্যে কবিতা পাঞ্চ্ করে দেওয়া– অনেকটা ছোটগল্পের মতো প্লট-বাঁধুনির চেষ্টা, কিছুটা ইচ্ছাকৃত দায়সারা ভাব দেখিয়ে সিরিয়াসনেস গোপন করা (সিরিয়াসনেস এবং আধুনিকতা বুঝি বিপরীতমুখী!), বিতর্কিত বই সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত সুচতুরভাবে গোপন করা, এবং চটুলভঙ্গিতে বইটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার সচেতন প্রয়াস এ রিভিউটিতে প্রকট।

আসলে এ-ধরনের মূল্যবান নিউজ ম্যাগাজিনে সমাজতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক কিংবা আধ্যাত্মিক (theological) দৃষ্টিকোণ থেকে রিভিউ লেখার কথাও নয়। 'To instruct, to amuse and to provoke'– এটাই এ ধরনের হাই প্রোফাইল স্টার-মিডিয়ার রিভিউ-পৃষ্ঠার (অন্যান্য পৃষ্ঠারও) অঘোষিত লক্ষ্য।

অবশ্য লেখক এখানে কিছু তথ্য দিয়েছেন– বইটির স্টোরি লাইনের একটা আদলও রয়েছে লেখাটিতে। আছে উপন্যাসের নামধাম, পাত্র-পাত্রী, স্থানকাল, পরিসর। মিথ এবং রিয়্যালিটি, বাস্তব এবং ফ্যানটাসি, থিয়লজি এবং পলিটিক্স, লোককথা এবং দর্শন– সবকিছুই যে এতে রয়েছে– তা'ও আমরা রিভিউ পড়ে জেনে যাই। বুঝতে পারি 'মধ্যরজনীর সন্তান সন্ততি' (Midnight's Children) এর চাইতে অনেক অনেক জটিল এ বইয়ের স্টাইল। খুব একটা সুখপাঠ্যও হবে না বইটি সাধারণ পাঠকের কাছে। আমাদের দেশে এ মহাকাব্যোপম উপন্যাস হৃদয়ঙ্গম করে আহত হবার মতো পাঠকও খুব বেশি

নেই– তা'ও বোঝা যায়। সমালোচক অবশ্য এ-বইকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতি হবে, বই না-পড়নেওয়ালাদের উচ্চকণ্ঠে নিবিষ্ট পাঠকরা কোণঠাসা হয়ে যাবেন, এটা খুব ভালোভাবে বুঝেও নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করাটাই বেছে নিয়েছেন। যতটুকু বললে না হয়, তার চাইতেও কম কথা বলেছেন। এ-প্রসঙ্গে আর কোন আলোচনায় না গিয়ে আমরা মধু জৈনের রিভিউটির মূল পাঠই এখানে ভাষান্তরে উপস্থাপন করছি :

শয়তানী পদাবলি

আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের শিখা থেকে বেরিয়ে এল দৈত্যটি, আরো একবার।... এবার সালমন রুশদির মন্ত্রসিদ্ধ গালিচা পাঠকদের নিয়ে চললো ঝঞ্ঝামুখর প্রান্তরে, যেখানে অতীত আর বর্তমান নিরন্তর লোফালুফি খেলায় মত্ত।.... 'শয়তানী পদাবলি'র নান্দীমুখ যেন বজ্রনির্ঘোষ : এয়ার ইন্ডিয়ার জাম্বো বিমান হাইজ্যাক; বোস্টন-৪২০ ভেঙে পড়েছে ইংল্যান্ডের মাটিতে; বেঁচে রইলেন মাত্র দু'জন যাত্রী, চলচ্চিত্র-তারকা জিব্রিল ফারিস্ত (অনেকটা ঠিক লম্বা-চোখা অমিতাভ বচ্চন আর রঙিন পর্দার দেবতা সেই এন.টি. রামারাওয়ের সংমিশ্রণ); অপর ব্যক্তিটির নাম সালোদিন চামচা– ইনি এক প্রবাসী ভারতীয়, মহারাণীর চেয়েও বেশি দেশপ্রেমী, জাতীয়তাবাদী। এভাবেই শুরু হয় ইতিহাস এবং ধর্মতত্ত্বের জটিল সুড়ঙ্গ পথে এলিস-ইন-ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড পরিক্রমা। মুখ্য চরিত্রেরা কাহিনীতে বার বার রূপ বদলাতে থাকেন– কখনো দেবদূত, কখনো বা জ্বলন্ত চক্ষু অতিকায় দানব। এরা অবাধে অসম্ভবের দেশ সমূহে বিচরণ করেন, নিজেদের ইচ্ছেমত– মার্গারেট থ্যাচারের ইংল্যান্ড থেকে ষষ্ঠ শতকে প্রাক্-মহম্মোদীয় পবিত্রভূমিতে; বোম্বাই ফিল্মি দুনিয়া থেকে শ্মশ্রু-গুম্ফ সম্বলিত মার্কসীয় 'আর্ট ফিল্ম' ওয়ালাদের ধূসর জগতেও।

বিশাল এ বইটি যেন বহুবর্ণ রঞ্জিত আতস-বীক্ষণ। কল্পনার ডানা মেলা উপমার মালা, অসংখ্য কল্প-কথার ভিড় আর অ্যালিগরিতে ঠাসা এ উপন্যাসে রয়েছে হিন্দি ডায়লগ, আপ্তবাক্য, বিজ্ঞাপণী-কথন এবং হিচকক্ সদৃশ কথকের ভূমিকায় রয়েছেন লেখক, সালমন রুশদি। পদে পদেই আছে চমক। তবে সব মিলিয়ে বইটি হ'ল ইসলামিক ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং মৌলবাদের উপর একটি অনমনীয় এবং অভূতপূর্ব আক্রমণ। ইসলামীয় মৌলবাদের সমালোচনা হিসেবে এ বই ভি.এস. নাইপলের 'বিশ্বাসীদের ভিড়ে' বইটিকে একেবারে ম্লান করে দেবে নিশ্চয়ই।

উপন্যাসটির সারকথা হ'ল সৃষ্টিতে সবকিছুই নিবিড় কার্যকারণ সূত্রে গাঁথা; (চূড়ান্ত বা অ্যাবসলিউট বলে কিছু নেই) স্বর্গ এবং নরকের মধ্যিখানে কোন স্থায়ী ভেদ রেখা নেই; দেবদূত আর দানবদের আলাদা করে সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভবই। কোনি পর্বতে দাঁড়িয়ে মাহোন্দ'নবী পর্যন্ত ধন্দে পড়ে গেছিলেন– কোনটা দেবদূতের কণ্ঠ আর কোনটা শয়তানের। এখানে রুশদিকে ইসলামীয় লোককথা আর বাস্তবতার প্রতি বড় রুষ্ট বলেও মনে হয়।

কোরান এবং বাইবেলের ঐতিহ্যের আলোকে লেখক যেন এখানে বর্তমান সময়ের অবাস্তব-বাস্তবের রহস্য উন্মোচনেই নেমেছেন। উপন্যাসের মধ্য পর্বে এলেন আয়েশা, মাহোন্দ নবীর দ্বাদশ পত্নীর অন্যতমা ইনি....।

স্বর্গলোক থেকে একে একে নির্বাসিত হলেন দেবতা এবং দেবদূত। এরপরই রুশদির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর– "জিব্রিল চেয়ে দ্যাখে ঈশ্বরকে... তাঁর দৃষ্টি যেন ঝাপসা। সে দ্যাখে তাঁরই সমবয়সী এক ব্যক্তি, বসে আছেন... সে লক্ষ করে ওই অলীক ব্যক্তির মাথায় নামছে টাক, খুঁসকিতে আক্রান্ত ইনি যেন, চোখে তাঁর চশমা সাঁটা। এইকি তাঁর প্রার্থিত সর্বশক্তিমান। 'কে তুমি?' শুধোয় সে? 'ওপরওয়ালা', উত্তর দেয় ছায়াপিণ্ডটি। 'কী করে জানবো তুমি নিচওয়ালা নও, নও ওই ব্রাত্যজনেরই একজন"?

এখানে তীর্থভূমি হয়ে ওঠে একটি ওল্টানো দর্পণ। মরুনগরী জাহিলায় দেখা দেয় মারি, উটদের মনে জাগে চাঞ্চল্য, আর তখনই আবু সিম্বেল হ'ন নিশ্চিত: 'তীর্থক্ষেত্র দাঁড়িয়ে আছে শহর এবং ধ্বংসের মধ্যিখানে।' বিদেশি দেবতার মূর্তির খোঁজ শুরু হয় তখন। কিন্তু এখানেও প্রতিযোগিতা। 'শাবা'তে তৈরি হয় বিশাল মন্দির– কালো-পাথরের দেউলকে ম্লান করে দেবে ব'লে। শাসককুলের সবকিছু মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন গতি রইল না।

জাহিলা-নগরীর কালো-পাথরের মন্দিরে রয়েছেন দ্বাদশ অন্তরালবর্তিনী পর্দানশীলা নারী। এরা হলেন দ্বাদশ-গণিকা। মাহোন্দর গণিকারা সব।....

রুশদি তাঁর বইতে নাম-উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেননি– একমাত্র নবী ছাড়া। স্বনামেই, সরাসরি 'কেতাব' থেকে এসেছেন এরা।.... ইসলামীয় লোককথা থেকে এসেছেন পৌত্তলিক দেবদেবী 'লাত' আর 'মনাত'।

বিশাল এ উপন্যাসে প্রব্রজন-থিম একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশীয় প্রবাসীরা নতুন রূপ ধারণ করে ইংল্যান্ডে এসে। রুশদির চরিত্ররা কেউ কেউ আবার নতুন প্রজন্মের অভিবাসীদেরই সন্তান-সন্ততি। এরা রয়েছে এদের ভাঙড়া-ডিসকো সংস্কৃতি নিয়ে, এদের জনক জননীরা রয়েছেন মাতৃভূমির স্মৃতি আগলে। এরা দিন কাটান পাকিস্তানের বাপ বাপান্ত করে এবং "এভাবেই সলোদিন চামচা শিখে নেয় এ-যুগের কুরুপাণ্ডবের কথা, চিনে নেয় বর্ণ বিদ্বেষী সাদা চামড়াদের, চিনে নেয় স্বনির্ভর কালোদেরও– এযুগের 'মহাভারত' তথা 'মহাবিলাত' এর অঙ্গনে।"

কল্পনার যাদুকরী কার্পেটে বসিয়ে লেখক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমাদের নিয়ে যান বিচিত্র কল্পলোকে। পাঠকেরা মাঝে মাঝে হয়ে যান একেবারে ভারমুক্ত, নিরালম্ব, ঠিক তবু নেশাক্রান্ত নয়। ইসলামী ধ্বজাধারীরা প্রথম সুযোগেই খেপে উঠবেন। শয়তানী পদাবলি অতিনিশ্চিতভাবেই একটি বিশাল বিতর্কের সূত্রপাত ঘটাতে চলেছে। ভুঁইফোড় প্রতিবাদীদের এখনই স্বোচ্চার হবার সময়।

(রচনা: মধু জৈন, অনুবাদ: লেখক)

শিল্প-সমালোচনা :

কোনও চারুকলার প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লোক উৎসব, শাস্ত্রীয় সংগীত বা রবীন্দ্রসংগীত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন প্রকাশনার একটি রীতি এখন প্রিন্টমিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চালু হয়ে গেছে ব্যাপকভাবে, এবং এ প্রতিবেদন রচনার কিছু পদ্ধতি বা ধারাও গড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সমালোচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সচেতনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, এখানেও তা সমভাবেই প্রযোজ্য। তবে পত্র-পত্রিকার একেবারে নির্দিষ্ট পরিসর বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমের নির্ধারিত টাইম-স্লট (Time slot, টিভি) অথবা চাংক্ (রেডিও Chunk)—এর সীমাবদ্ধতা এখানে মেনে নিতেই হবে।

সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রে শিল্প-সমালোচনার জন্য সাধারণত চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি স্থানই বরাদ্দ থাকে (কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়েই)। এতএব এ বিভাগের লেখকের Motto : 'Brevity is the soul of wit'।

প্রদর্শনীটি/অনুষ্ঠানটি কী, কোথায়, কবে, কার দ্বারা? আয়োজকের নিজস্ব কোন ঘোষিত লক্ষ্য আছে কি — এ সমস্ত তথ্যই এতে থাকতে হবে। অনুষ্ঠান/প্রদর্শনীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ না থাকলে পাঠকেরা পড়বেনই বা কেন, কিন্তু বিরাট নিউজ স্টোরি করে নিলে সম্পাদকই বা ছাপবেন কী করে— এ সমস্যার সমাধান যিনি করতে পারেন তিনিই এ কলামে লেখার যোগ্য অধিকারী। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, ঝরঝরে দ্ব্যর্থহীন ভাষা, চিত্রধর্মী বর্ণনা, ব্যঞ্জনাময় শব্দচয়নের ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই।

চিত্র সমালোচককে শব্দের মাধ্যমে এক্সিবিটগুলোকে পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তাই তাঁর ভাষা হবে চিত্রধর্মী, এতে ভিস্যুয়েল এফেক্ট থাকতেই হবে। শিল্পগুলোর আঙ্গিক, টেকনিক, শিল্পীর প্রতিভা ও কর্ম বিষয়ে সমালোচকের সচেতনতা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমালোচনা যে কত সৃজনশীল হতে পারে তা দেখিয়েছেন The Statesman-এর নাম বিহীন Art Critic/Reviewerরা (পরবর্তীতে এদের অনেকের নাম আমরা জেনেছি): 'দেশ' পত্রিকায় রাজ্যেশ্বর মিত্র, দেবাশিস দাশগুপ্ত, নীলাক্ষ গুপ্ত, শোভন সোম — এদের রবীন্দ্রসংগীত এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমালোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প/সংগীতের তাত্ত্বিক হয়েও প্রায়োগিক কলাকৌশল সম্বন্ধে এরা সচেতনতা দেখিয়েছেন; শিল্পের সমঝদার হয়েও অসংযত উচ্ছ্বাস প্রবণতাকে এরা প্রশ্রয় দেননি, প্রায়োগিক ভ্রান্তি এদের পীড়িত করলেও এরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেননি। এদের রচনা শিল্পীদের তো বটেই পাঠককেও উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত এবং শিক্ষিত করেছে।

তবে এর বিপরীতও যে ঘটেনি বা ঘটে না, তা নয়। শিল্প-সংস্কৃতি-কলা সমালোচনার নামে প্রতিদিন যে হাজার হাজার অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রে পিষ্ট হয়, এর অনেকটাই যে অ-কথা, কু-কথা, নিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, দলবাজি, আক্রোশ, চাটুকারিতা— এসব বুঝে নেওয়া যায় সহজেই।

উন্নতমানের সমালোচনা-লিখনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেই লেখক বুঝতে পারবেন, এ কাজটি সম্ভাবনাপূর্ণ, সৃজনশীল এবং আকর্ষণীয়।

রেডিও-টিভি সমালোচনা :

শিল্প-সংস্কৃতি-কলা বিভাগের মতো রেডিও-টিভি পর্যালোচনার জন্যও সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র বা নিউজ-ম্যাগাজিনে একটি স্থান নির্দিষ্ট থাকে। এ কলামের পাঠকও রয়েছে, রয়েছে এর একটি বিশেষ গুরুত্বও।

আঞ্চলিক বেতারকেন্দ্র কিংবা দূরদর্শন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, সম্প্রচার, সময় এবং অনুষ্ঠানের মান নির্ণয়ে এ সমস্ত লেখার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সুচিন্তিত, সুলিখিত এ সমস্ত পর্যালোচনা একদিকে যেমন রেডিও টিভি কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে শ্রোতা-দর্শকের অভিমত, প্রত্যাশা কিংবা অনুষ্ঠান প্রত্যায়িত মানে না পৌঁছালে হতাশা জ্ঞাপন করে, তেমনি অন্যদিকে, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী, লেখক, নাট্যকার, ভাষ্যকার, বক্তাদের বিভিন্ন দিকে সচেতন ক'রেও তোলে।

রেডিও-টিভি সমালোচনার প্রাথমিক শর্তই হল অনুষ্ঠানগুলো নিজে শোনা বা দেখা। টেপ রেকর্ডার বা ভিসিআর-এর সাহায্য নিলে অবশ্য অন্য কথা। তবে একজন লেখকের পক্ষে সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রেডিওতে কান পেতে বসে থাকা কিংবা টিভির পর্দায় চোখ মেলে বসে থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য সমালোচকের এত পরিশ্রম করার প্রয়োজনও নেই, তাঁকে যা করতে হবে তা হল, কী কী অনুষ্ঠান তিনি শুনবেন বা দেখবেন তা স্থির করে নেওয়া এবং সময়সূচির সঙ্গে অনুষ্ঠানটি শোনা বা দেখার সময়টুকু করে নেওয়া। সমালোচকের পক্ষে একই সঙ্গে কথিকা, সংগীত, নাটক, সমীক্ষা, সমস্ত দিক আলোচনা করা নয়। তাকে হতে হবে সিলেকটিভ ও মেথডিক্যাল। রেডিওর অনুষ্ঠান — Spoken Words, Music, Instruments, Feature এবং Miscellenous-এর মধ্যে ঠিক করে নিতে হবে কোন অনুষ্ঠানের কতটুকু এবং কীভাবে সমালোচনায় আনবেন। সাহিত্যবাসর, লোকগীতি, রবীন্দ্রসংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত, রেডিও ম্যাগাজিন, বিশেষ অনুষ্ঠান– এসবকে সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়। রেকর্ডে প্রচারিত অনুষ্ঠান, প্রচারধর্মী নাটক, চাষ আবাদের কথা, সংবাদ সমীক্ষা, ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠান, মহিলা মজলিস এ ধরনের রুটিন অনুষ্ঠান শোনা একজন ব্যস্ত লেখকের পক্ষে সম্ভব নয় — এবং পত্রিকার কয়েক ইঞ্চি পরিসরে এত সব কিছুর জন্য স্থানই বা কই?

টিভি-সমালোচনার ক্ষেত্রেও নির্বাচন করে নিতে হবে কোন্ অনুষ্ঠানকে আলোচনায় ধরবেন। তবে এ ক্ষেত্রে যে একটি নীতিই চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনশীল, তা নয়, এটা সমালোচকের মনে রাখা চাই।

রেডিও-টিভি পর্যালোচনায় কঠোর সমালোচনা করা থেকে সততই বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। অনুষ্ঠান বহির্ভূত কোন প্রসঙ্গ টেনে না আনাই ভালো। এক শিল্পীকে নিন্দা করে

আরেক শিল্পীকে অতিরিক্ত প্রশংসা করা, প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ঠেস্ দেওয়া, অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় আমলাতন্ত্রের দুর্নীতির অনুসন্ধান, কা'কে বঞ্চিত করে কা'কে সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, কথিকায় কোন্ গবেষককে অনেকদিন ডাকা হচ্ছে না, কোন্ প্রডিউসার টাকা নিয়ে... ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থানীয় সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু অনুষ্ঠান পর্যালোচনা কলামে এ-সব প্রসঙ্গ অরুচিকর, অন্যায়; অবান্তর তো বটেই।

ভুল ত্রুটি ধরিতে দিতে তো হবেই, বিরূপ-সমালোচনা যে হবে না তা-ও নয়; কিন্তু কলামটি যে শিল্প-সংস্কৃতি কলাম, ক্ষোভ বা ক্রোধ প্রকাশের স্থান নয়, এ কথাটি ভুললে চলবে না।

অসাবধানতা বা অসচেতনায় ঝক্‌মকে রোদ্দুরের দিনে রেকর্ডে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' বাজালে যে খাপছাড়া লাগবে, ঘনঘোর বর্ষার দুপুরে বসন্তের সুর শোনালে যে ঠিক মেজাজটি আসবে না— এসব খুঁটিনাটি বিষয়ও রেডিও পর্যালোচনায় আসতে পারে। চৈত্রের দুপুরে যে গান শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হবেন, হেমন্তের সন্ধ্যায় তা একেবারে প্রাণহীন লাগতে পারে— এ ধরনের ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ মাঝে মাঝে বেতার পর্যালোচনাটিতে নতুন মাত্রা দিতে পারে, তবে রোজ নয়। রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়ে 'আপনারা অতুল প্রসাদের গানটি শুনলেন' জানালে এটাও সমালোচনায় আসতে পারে। কিন্তু এ-জন্য 'এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানে একজনও কি শিক্ষিত ব্যক্তি নেই যে রবীন্দ্রসংগীত আর অতুল প্রসাদের গানের পার্থক্য বুঝতে পারেন না' — এ ধরনের কঠোর ভর্ৎসনার প্রয়োজন নেই। চিঠিপত্রে (খবর কাগজে) এসব চললেও সমালোচনার কলামে নৈব নৈব চঃ।

রেডিও এবং টিভি, দুটো বৈদ্যুতিন মাধ্যমেরই কিছু নিজস্ব পরিভাষা রয়েছে, এগুলোর যথাযথ প্রয়োগও এখানে সঙ্গত। দুটো মাধ্যমের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় জানার আছে, বোঝার আছে, গবেষণা করারও আছে, তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উভয় দিকেই। কিন্তু সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে সেই কয়েক ইঞ্চি স্থানই বরাদ্দ এ খাতে। তাছাড়াও, এ লিখন কর্মের অর্থকরী দিকটিও খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রভূত সম্ভাবনা থাকলেও প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে একজন মিডিয়া পর্যবেক্ষককে অন্য বিষয়েও লিখতে হয়, জীবন জীবিকার জন্য অন্য কিছুও করতে হয় এবং এ জন্যেই এত সম্ভাবনাময় এ বিষয়ে সব সময়ই অ্যামেচারিজমের ছোঁয়া থেকে যায়।

অবিচ্যুয়ারি-লিখন :

রাজনৈতিক নেতা, দেশের কর্ণধার, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এরকম ব্যক্তি মারা গেলে স্থান পান খবর-কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এবং এদের মৃত্যুটি হয় 'নিউজ আইটেম'। কিন্তু উচ্চপদস্ত প্রতিভাবান বা জাঁদরেল আমলা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পণ্ডিত গবেষক কিংবা

আঞ্চলিক সমাজকর্মী, শিক্ষক, কবি সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার, নিঃসঙ্গ চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, শিল্পপতি— এরা প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেলেও এদের জন্য কাগজের ভিতরের পৃষ্ঠার একটি কোণ নির্দিষ্ট থাকে এবং মোটামুটি একটি সীমিত অক্ষর সংখ্যাও বরাদ্দ থাকে। অবশ্য স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় গুরুত্ব অনুযায়ী এর পরিবর্তনও হয়। প্রথম পৃষ্ঠার এক কোণায় অবিচ্যুয়ারি শুরু করে রচনাটিকে ভেতর টেনে নেবার প্রথাও রয়েছে সর্বভারতীয় পত্রিকাগুলোতে, তবে এটা গুরুত্ব অনুযায়ীই, এবং এ-ক্ষেত্রে সম্পাদক বা নির্বাহী সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

কা'কে নিয়ে অবিচ্যুয়ারি হবে আর কা'কে নিয়ে নয় — এর কোন স্থির নিয়ম নেই; যে কোন ব্যক্তিই এ সুযোগ লাভে ধন্য হতে পারেন (তবে মৃত্যুর পরই)। সুদক্ষ লেখকের হাতে পড়লে কে অবিচ্যুয়ারি পাচ্ছেন এটা কোন সমস্যাই নয়; মৃত ব্যক্তিকে কীভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, ওঁর জীবনের, মনের কোন দিকটিকে 'ফোকাস' (focus) করা হচ্ছে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

বৈচিত্র্যপূর্ণ আমাদের এ সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিই স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট এবং কোন না কোন ভাবে অনন্য। একজন সার্থক অবিচ্যুয়ারি লেখক সেই ব্যক্তির ভেতরের সত্তাটিকে তুলে ধরতে পারেন শৈল্পিক দক্ষতায়, অতি অল্প শব্দ ব্যবহার করেই।

অবিচ্যুয়ারি কী, এর উত্তরের সন্ধানে আমরা অবিচ্যুয়ারি কী নয়, তা'ই খুঁজে নিতে পারি। অবিচ্যুয়ারি কী নয়, তা নিম্নরূপ :–

(ক) খবর নয়; মৃত্যু-সংবাদ এখানে প্রাসঙ্গিক, মুখ্য নয়।

(খ) জীবনী নয়; জীবনের বিভিন্ন তথ্য, জন্মমৃত্যু, কর্ম ইত্যাদি থাকবে, কিন্তু এটা এর চাইতে আরো অন্য কিছু।

(গ) প্রশস্তি নয়; যদিও প্রয়াত ব্যক্তির জীবনের উজ্জ্বলতম দিকটি তুলে ধরাই এখানে কাঙ্ক্ষিত।

(ঘ) নিন্দা নয়; এতে মার্জিত ও শিষ্ট সমালোচনা থাকতেই পারে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে তাঁকে অশ্রদ্ধেয়, অপাংক্তেয় প্রতিপন্ন করা অবিচ্যুয়ারি লেখকের অভিপ্রেত নয়। বহুনিন্দিত, সমাজবিরোধী, দেশদ্রোহী, অন্ধকার জগতের বাসিন্দার জন্য তো খবর কাগজের প্রথম পাতাই রয়েছে, অবিচ্যুয়ারির কী প্রয়োজন?

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর একটি কবিতার মধ্যে অতি সুন্দর, সহজ সরল এবং পুরোপুরি আধুনিক চেতনাসম্পন্ন অবিচ্যুয়রির সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠেছে। বর্তমান প্রসঙ্গের সমাপ্তিতে আমরা পুরোপুরি কবিতাটিই উদ্ধার করছি :

লেনিন

না, তিনি মানুষের জন্য কোনো তুচ্ছ কাজও করে যাননি
দুর্গতের জন্যও না।
তিনি দুর্গত হয়ে এবং দুর্গতের যা স্বাভাবিক, যা অমোঘ
তাই করে গেছেন।
'মহান' নামক বাল-শোভন শব্দটি
তাঁর নামের আগে শোভা পায় না।
সারা পৃথিবীতে এই বিশেষণটির হাজার গণ্ডা দাবীদার
সেই-সব অতিমানুষদের ভীড়ের নন তিনি।
খুব আল্‌তো ভাবে তাঁর নামের প্রথম অংশ পর্যন্ত
আমরা ছেঁটে দিয়েছি
কারণ, তিনিই তো ইতিহাসের উত্তর-ভাগ, প্রান্তিক, প্রগতি
তিনি লেনিন
না, কোনো দুঃখীর জন্য এক ফোঁটাও
চোখের জল ফেলেননি তিনি
তিনি জানতেন, চোখে আগুন জ্বেলে
দুঃখকে সমূলে উপড়ে নিতে হয়,
না, কোনো আর্তকে একটা ছেঁড়া কম্বলও
দান করেননি তিনি
তিনি জানতেন, যে-মানুষটা শীতে কাঁপছে
কম্বলটা তার-ই
না, স্বয়ং দৌত্যে মানুষের পাপের মার্জনা আদায়ের ভূমিকায়
মানুষের কাঁধে চড়ে বসেননি তিনি।
তিনি বিশ্বাস করতেন, কাঁধে চড়ে নয়
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলে মানুষের মিছিল।
তিনি এই ধরাধামে কোনোদিন 'আবির্ভূত' হননি
'অবতীর্ণ'ও না
তিনি এই মাটির পৃথিবীতে দুশো কোটি মানুষের মতো
মায়ের পেটে জন্মেছিলেন
তাঁর চোখ ছিল মানুষের মতো তীক্ষ্ণ
তাঁর কান ছিল মানুষের মতো প্রখর
তিনি গন্ধে টের পেতেন ভালো এবং মন্দ
তিনি হাজারো মানুষের

রথের রশি ধরে টান দিয়েছিলেন সামনের দিকে,
কারণ, তাঁর শরীরে ছিল মানুষের মতো শক্তি।
তিনি ছিলেন আপনজন
তাঁকে ছন্দের শৃঙ্খলে কৃত্রিমতার বৈঠকখানায়
বেঁধে রাখতে পারলুম না।
অবধারিত গদ্যের মতো তিনি চলে আসেন অনাবৃ অন্দরমহলে
ছেঁড়া তোষক পেড়ে নিয়ে এলিয়ে দেন শরীর
পরস্পরের ঘামের গন্ধ আমরা বুঝতে পারি সহজে
আমরা স্বজাতি
গৌরবে যারা গুরুজন, তাদের উদ্দেশে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম
শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয় —
তিনি আপনজন
তাঁকে দেবার মতো 'আমি'ই তো রয়ে গেলাম।

(এই পথে অন্তরা, অনন্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ: ২৫, ২৬)

পর্ব-৫

রেডিও-টিভির স্ক্রিপ্ট

বৈদ্যুতিন মাধ্যম, কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

বর্তমান যুগটিকেই বলা যেতে পারে গণমাধ্যমের যুগ। এ মাধ্যমটির ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সূচনায় যা ছিল পশ্চিমের মুষ্টিমের কতিপয় বিত্তবানের বিলাস, ক্রমে তা হয়ে গেল ব্যাপক জনগণের সম্পত্তি, 'গণ'-মাধ্যম। প্রথম-বিশ্বটিকে জয় করে এ-মাধ্যম এল তৃতীয় বিশ্বে; সেটা বিংশ শতকের প্রথম থেকে মধ্য ভাগের দশকগুলোর কথা।

যুগটি ছিল একান্তই শ্রুতি-মাধ্যমের অর্থাৎ রেডিও-র যুগ। পশ্চিমে যার উদ্ভব, কয়েকটি দশক অতিক্রম করে তা' এল পূর্ব গোলার্ধে। আবার আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বে যখন রেডিও-র জয়জয়কার, তখন ইউরোপ-আমেরিকায় টিভির নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে পড়ছে। এবং এ পরিস্থিতিতে কিছুদিন রেডিও আর টিভি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজ নিজ স্থানে নিজস্ব অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটিও শেষ করে বসে আছে। কিন্তু তৃতীয়-বিশ্বে আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে ঝড়ো হাওয়ার মতো টিভি-র আবির্ভাব সূচনাতেই প্রচণ্ড আঘাত হানলো রেডিও-র উপর। রেডিওর চাইতে অনেক বেশি বিস্তৃত হ'ল এ'র নেটওয়ার্ক অতি অল্পদিনেই। আমাদের দেশে কঠোর ভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও-মাধ্যমের বিধি নিষেধের অনেক কিছুই শিথিল করে দেওয়া হ'ল সরকার-নিয়ন্ত্রিত 'দূরদর্শনে'। আর যে-মুহূর্তে

উপগ্রহ-সংস্কৃতির কাছে সরকারকে আত্মসমর্পন করতে হ'ল সে-মুহূর্তেই জাতীয় জীবনে বেশি শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল টিভি। মেট্রোপলিটান শহর থেকে জেলা শহর, জেলা শহর থেকে শহরতলি পেরিয়ে এখন প্রত্যন্ত গ্রামে-গ্রামান্তরেও বিস্তৃত হ'ল ক্যাব্‌ল-লাইন; প্রাইভেট চ্যানেলের অহর্নিশি সম্প্রচারে এ মাধ্যমটি উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত, এমনকী বিত্তহীনের কাছেও বাস্তব হিসেবে প্রতিভাত হ'ল।

এ প্রবল স্রোতের কাছে অডিও-মিডিয়া, অর্থাৎ রেডিও তো প্রথম অঙ্কেই পরাজয় স্বীকার করল, প্রিন্ট-মিডিয়ায়ও লেগেছিল একটি বিরাট ধাক্কা। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে পশ্চিমে যেমন, আমাদের এদিকেও তেমনি প্রতিটি গণমাধ্যমকে নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সমঝোতা ক'রে নিতে হ'ল। সংবাদপত্র, সংবাদ সাময়িকীতে রঙ চড়ল, প্রসাধনের মাত্রা গেল বেড়ে, বেশবাসের পারিপাট্যে এবং নৈপুণ্যে অভিনবত্ব দেখা দিল, পরিবর্তন দেখা দিল তার ভাষায়, চিন্তায়, চেতনায় এবং এমনি করে বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটিয়ে পাঠকদের পুনরায় টেনে নিতে প্রয়াসী হল এ মাধ্যমটি। ঠিক এমনিভাবেই শ্রুতি-মাধ্যম, অর্থাৎ রেডিওকেও পরিবর্তনের স্রোতে গা ভাসাতে হ'ল; প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়ল, বাড়ল সময়সীমা, অনুষ্ঠানের বাণিজ্যিকীরণ শুরু হ'ল; সরকার-নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটির প্রথানুগ কিছু স্পর্শকাতরতা কমলো, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে সৃজনশীলতা, মুক্তচিন্তার দরজাও একটু খুলে দেওয়া হ'ল; এমনকী পশ্চিমী সংস্কৃতির উচ্ছৃলতায় রীতিমত দীক্ষিত যুবসমাজকে শ্রোতার দলে টেনে নেবার জন্য নিত্য নতুন কসরৎও শুরু হ'ল।

এ সময়টাকেই বোধ হয় ইংরেজিতে বলে 'ট্রান্‌জিশন-পিরিয়ড'। এ ট্রান্‌জিশন শুধু রেডিও-র নয়, টিভিরও।

একদিকে রেডিও তার গৌরবময় ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে; শ্রোতার মনোযোগ হারিয়েছে, সৃজনশীলতার অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে নিজে; অপরদিকে টিভিরও সৃজনশীল সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না; উদ্দামতা, উচ্ছৃলতা (উচ্ছৃঙ্খলতা?) যৌবনের তেজে প্রমত্ত এ মাধ্যমটি পারছে না কোন স্থিরমাত্রায় পৌঁছোতে, ফলতঃ দর্শক মনে ক্লান্তির ছাপ ক্রমশই প্রকট হচ্ছে। ঠিক এ চেতনারই যেন প্রকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত কবিতাটিতে :

রোজ রাতে রেডিয়োকে কানমলা দিয়ে যুবকটি শুতে চলে যায়
বিলাতি মদের গন্ধে ঘুঘুচোখ দুপুরের ছেলে
প্রাক্তন প্রেমিকার মতো রেডিওটি অন্ধকারে একা জেগে থাকে।
বস্তুত প্রতিভাময়ী, শিল্পী কবি সাংবাদিক সংস্কারক
যাদের ব্যক্তিত্বে লোক চুম্বকের মতো স্পৃষ্ট হয়
যুবতীর সব ছিল

ভৈরবী ভোরের কিংবা সন্ধ্যা রাগিনী পুরবীর স্বতঃস্নিগ্ধ ছায়া
মাঝে মাঝে গল্পগুচ্ছ, মাঝে মাঝে শম্ভু মিত্রের স্বর
মাঝে মধ্যে রবিঠাকুর, কখনও বা নজরুল উদাস
কী শুনবে? যা-ই চাও; একজন প্রেমিক মানুষ
যা কিছু চাইতে পারে সব দিতে চেয়েছিল
প্রাক্তন প্রেমিকাটি, হোক্ রোগা, হোক্ কালো
হোক্ একটু বেশি কথা বলা
হোক্ দেহ স্পষ্ট নয়, হোক্ দেহে দৃশ্যসুখ বৃথা
যে রকম একখানি আধুনিক টেলিভিশনের
পাট পাট শাড়ি আর কাটাকাটা খানখান বুলি
দেহ চাও, রক্ত চাও, সব কিছু ছুঁতে পারা যায়
সেরকম ছিল না সে
তবু সেই রেডিয়োর মতো মেয়ে সন্ধ্যা সকাল
জীবন সাজিয়েছিল মৃদু হর্ষধ্বনি
আজ তাকে কান মলে তার স্মৃতি ওয়েস্ট বক্সে ফেলে দিয়ে
সিগারেট ক্ষিপ্র টেনে বিবাহিত যুবকটি শয্যার দিকে চলে যায়
অন্ধকারে জানালার ধারে কালো রোগা রেডিয়োটি
সারারাত মূক হয়ে একাকী কাটায়

("রেডিয়ো", শ্বেতা চক্রবর্তী, দেশ ২২ আগস্ট, ১৯৯৮)
নিম্নরেখা বর্তমান লেখকের

এদের ভাষা আলাদা, ভঙ্গিও

রেডিও যদিও শাব্দিক, আর টিভি যদিও চাক্ষিক (শব্দটি ব্যবহার করেছেন শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ), তবু এদের পেছনে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর হাতে থাকে রেকর্ডার নয়, ক্যামেরাও নয় — কলম।

কিন্তু এ কলমচির চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি অপরাপর লেখকদের চাইতে ভিন্ন। রেডিও-তে তাঁর দায়িত্ব শব্দের মাধ্যমে শ্রোতাদের দেখার কাজটি করিয়ে নেওয়া; আর টিভি-তে তাঁর কাজ হ'ল দেখা এবং শোনার মধ্যিখানের ফাঁকটুকু ভরাট করে দেওয়া, অনুভব প্রক্রিয়াকে পূর্ণতার দিয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করা এবং আরো অনেক কিছুই।

রেডিও-টিভির প্রতিটি অনুষ্ঠানের পেছনেই থাকে একটি লিখিত বয়ান, অর্থাৎ স্ক্রিপ্ট (script); এবং পরিচালক, প্রযোজক, শিল্পী, ভাষ্যকার, অভিনেতা, কথক সবাইকে স্ক্রিপ্টকে মান্য করে চলতে হয়। তাঁকে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, এত কাছাকাছি

অবস্থান সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্র এবং পদ্ধতিগতভাবে রেডিও আর টিভি একটু দূরে দূরেই আছে পরস্পর পরস্পরের থেকে।

কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে রেডিও-র প্রাধান্য বেশি, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় টিভি-ই উপযুক্ত মাধ্যম। চিত্রকলা প্রদর্শনীর প্রতিবেদন যতই সুলিখিত, সুপঠিত হোক্ না কেন, টিভির ক্যামেরার সঙ্গে পেরে উঠবে না; আবার যতই পরিপাটি করে সেট্ সাজানো হোক না — টিভি-র পর্দায় সারণি, পরিসংখ্যান বার বার দেখানোই হোক না কেন, বিচিত্র রঙের ছোপ দিয়েই হোক না তবুও অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য বিষয়ক চিন্তাচর্চা টিভির চেয়ে রেডিও-র মাধ্যমে অনেক সহজে, সুন্দরভাবে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

রেডিও এবং টিভি দুটো মাধ্যমেরই ভাষা আলাদা।

প্রথম মাধ্যমটি 'একটু বেশি কথা বলা'; আর স্পষ্ট অবয়বে, দৃশ্যসুখময়, দ্বিতীয়টির মুখে 'কাটাকাটা খান্‌খান্ বুলি'। তাই একজন স্ক্রিপ্ট লেখককে স্বতন্ত্রভাবেই দুটো মাধ্যমের নিজস্ব ভাষাটি শিখে নিতে হবে — এবং রেডিও-টিভির স্ক্রিপ্ট লেখার সম্ভবতঃ এটা প্রাথমিক না হলেও অন্যতম শর্ত।

প্রসঙ্গ রেডিও-স্ক্রিপ্ট

রেডিও হ'ল একটি শ্রুতিমাধ্যম। শব্দ ও ধ্বনি'ই এর মুখ্য উপাদান, শ্রোতাদের কাছে ঘটনা, বক্তব্য, চিন্তা, তথ্য, তত্ত্ব উপস্থাপনা করতে হবে এই দুটো উপাদান দিয়েই।

প্রিন্ট মিডিয়ার চাইতে কাজটি যথেষ্ট দুরূহ, কারণ এখানে সবকিছুই যে অলীক (abstract); কোন স্থায়ী অক্ষরমালার শৃঙ্খল নেই, নেই পেছন ফিরে আরেকবার দেখে নিয়ে বুঝে নেবার সুযোগ।

বেতার যন্ত্রে উচ্চারিত শব্দ একটিবার মাত্র কানে-প্রবেশ করেই শেষ হয়ে যায় — অথচ আমরা এর অনেককিছুই মনে রেখে দিই, আবার অনেক কিছুই ভুলে যাই; অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের এড়িয়ে যায়, আবার অনেক অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও আমাদের মনে স্থায়ীভাবে আসন পেতে বসে।

রেডিও-র অনুষ্ঠান আমাদের চোখে-দেখার কাজটি করিয়ে নেয় চিত্রধর্মী বর্ণনার গুণেই, অনুভব করিয়ে দেয় শব্দের সঙ্গে ধ্বনি সামঞ্জস্য ঘটিয়ে, নৈঃশব্দ্য আর শব্দের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সার্থক রেডিও অনুষ্ঠান কানের ভেতর দিয়ে একেবারে 'মরমে' প্রবেশ করে, মনটাকে সৃজনশীল করে তোলে এবং তখন অ-দেখা জগৎ হয় দৃশ্যমান, অক্ষর বিন্যাসের শাসন ছাড়া'ই সঠিক পথে এগিয়ে চলে শ্রোতার চিন্তা-স্রোত।

এত সব কথার পরও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রেডিওর সমস্ত অনুষ্ঠানের পেছনে রয়েছে এক টুকরো কাগজ এবং এর পেছনে রয়েছেন একজন লেখক। কয়েকটি

ব্যতিক্রম বাদ দিলে রেডিওর প্রধান অনুষ্ঠানগুলো কখনওই তাৎক্ষণিক অর্থাৎ extempore হয় না, পূর্ব নির্ধারিত লিপি অনুয়ায়ীই হয়। কিন্তু এ লিখন কর্ম অন্য মাধ্যমের লিখন-কর্ম থেকে ভিন্ন। রেডিও-লেখকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সব সময়ই মনে রাখতে হয়, তা হ'ল তাঁর শ্রোতা (পাঠক নয়) বই, পত্র-পত্রিকার পাঠকদের চাইতে গুণগতভাবে ভিন্ন, সংখ্যার দিকে অধিক। রেডিওর শব্দ পৌঁছাতে চায় শিক্ষিত, নিরক্ষর উভয়ের কাছেই, কিন্তু লিখিত-রচনা পৌঁছোয় নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত পাঠকের কাছেই।

'পাঠকের' পক্ষে বোঝার দায়িত্ব নিজের উপর নেবার সুযোগ এবং ক্ষমতা যতটা বেশি, 'শ্রোতার' ক্ষেত্রে তা নয়। অতএব — রেডিও-লেখকের কৌশল, পদ্ধতি এবং কাজের ব্যাপ্তি বই, পত্র-পত্রিকার অর্থাৎ প্রিন্ট মিডিয়ার লেখকের কর্মপদ্ধতির থেকে আলাদা।

এ প্রসঙ্গে এ কথাগুলো মনে রেখেই পরবর্তী অংশে আমরা কয়েকটি রেডিও অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট রচনার ওপর আলোকপাত করব।

কথিকা

রেডিওর বহুশ্রুত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে কথিকা তার স্থান করে নিয়েছে। আকাশবাণী তো বটেই, বিদেশি বেতার তরঙ্গগুলোতেও কথিকা শোনা যায় নিয়মিত ভাবে। বাংলাদেশ বেতার, বিবিসির ইংরেজি এবং বিদেশি, বিশেষ করে বাংলা ভাষার অনুষ্ঠান, কিংবা ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠানে কথিকা থাকবেই; নামকরণের একটু হেরফের হয়েই থাকে অবশ্য। কিন্তু এ বিশেষ অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচারিত হলেও এগুলোর মধ্যে মৌল পার্থক্য খুব একটা নেই। এ কথিকা কীভাবে লেখা উচিত, কীভাবে সচরাচর লেখা হয়, কী করলে আরো আকর্ষণীয় করা যায়, এ ভাবনার আগে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক, কথিকা বলতে কী বোঝায়?

কথিকা হ'ল একটি একক আলোচনা (সংলাপ নয়)। একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে একেবারে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে এ অনুষ্ঠানটি। এটা অনেকটা লিখিত-মাধ্যমের প্রবন্ধ বা নিবন্ধের শ্রুতি প্রতিরূপ। কিন্তু লিখিত রচনা থেকে এটা আলাদা। বই বা প্রকাশিত নিবন্ধ রেডিওতে পাঠ করলে তা সব সময় শ্রুতি সুখকর যে হবে তা নয়, শ্রোতা প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন। আবার রেডিওতে প্রচারিত কথিকা কাগজের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হ'লে পাঠকের পদে পদে হোঁচট খাবার সম্ভাবনাও থাকে। কারণ পদ্ধতিগতভাবে দুটোই আলাদা।

- কথিকা বলা হয়, পাঠ করা হয় না। তাই,
- কথিকা লিখতে হবে সম্পূর্ণ মৌখিক ভাষায়। বিষয়বস্তু যা'ই হোক্ না কেন, রচনাটি যেন কখনই 'কেতাবি' না হয়। সাধু-ভাষায় কথিকা হয়'ই না।

রেডিও

শব্দ ধারণ যন্ত্র

- দীর্ঘ, জটিল বাক্যকে এক সূত্রে গাঁথতে হলে কমা, ড্যাস, সেমিকোলন ইত্যাদির প্রয়োজন, কিন্তু কথা বলার সময় দৃশ্যত এদের কোন ভূমিকা থাকে না। কথিকা রচনায়ও তাই এদের যথাসম্ভব ছুটি দিয়ে বাক্যগুলো সহজ, সরলভাবেই লিখে নিতে হবে। দীর্ঘ এবং জটিল বাক্য সম্বলিত কথিকা অসংলগ্ন হয়ে যেতে বাধ্য।
- পৃষ্ঠা সংখ্যা নয়, সময়সীমা মেপেই কথিকা রচনা করতে হবে।
- মূল প্রসঙ্গ থেকে অন্যপ্রসঙ্গে বার বার সরে গেলে শ্রোতারা খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন, অমনোযোগী হয়ে যেতে পারেন। অবশ্য সুদক্ষ লেখক বার বার প্রসঙ্গান্তরে বিচরণ করেও মূল বক্তব্যটি সার্থকভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম।
- এক সঙ্গে একাধিক বিষয়ের অবতারণা করে সুন্দরভাবেই নিবন্ধ রচনা করা যায়, কিন্তু কথিকায় অধিক বিষয় নিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বেরিয়ে আসা খুব সহজসাধ্য কর্ম নয়।
- কথা বলার সময় আমরা নিজের ইচ্ছেমত অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিকভাবেই শুরু করি। কথিকা রচনায়ও এটা করা যায়। 'আজকে আমাকে — প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে হচ্ছে,' বা 'আমাদের আলোচ্য বিষয় হল —', এরকম আনুষ্ঠানিক শুরু কথিকাটিকে একেবারে মাটি করে দেয়। এ কাজটি অনুষ্ঠান-ঘোষক তো সবে শেষ করলেন, আবার পুনরাবৃত্তি কেন?
- শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রোতার কৌতূহলকে জাগিয়ে রেখে, তাঁদের পুরো মনোযোগটি আকর্ষণ করে রাখতে হলে কথিকার বক্তব্যটিকে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। আমাদের কথা বলার পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই সুপরিকল্পিত নিবন্ধ রচনার পদ্ধতির চাইতে ভিন্ন। তাই কথিকা রচনায় মনের কথাটি যেভাবে আসে, ঠিক সেভাবেই বাক্য বিন্যাস করা উচিত, তবে অসংলগ্নতা যেন থাকে না সেটা দেখতেই হবে।
- কথিকায় আনুষ্ঠানিক ভূমিকার কোন স্থান নেই। ঠিক তেমনি আনুষ্ঠানিক উপসংহারও ভূমিকাহীন। 'পরিশেষে আবার মনে করিয়ে দিই ...' কিংবা 'আমরা সমাপ্তিতে এ-কথা বলতে পারি ...' — এসব আনুষ্ঠানিক রচনাভঙ্গি শ্রোতামনকে অহেতুক ক্লান্ত করে তোলে।
- কথিকার সমাপ্তি যেন আলোচিত প্রসঙ্গটির একেবারে ইতি-টেনে না দেয়। 'অতএব,আমরা বলতে পারি ...', বলে সব সমস্যার সমাধান করে, সমস্ত চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বক্তব্যের ঝাঁপিটি একেবারে বন্ধ না-করে সমাপ্তিটি খোলা রাখাই কাম্য। ছোটগল্পের মতই open-ending রাখলে শ্রোতার মনে বিষয়টি দীর্ঘক্ষণ ক্রিয়া করবে; এবং শ্রোতাদের চিন্তা

চেতনাকে সচল করে তোলাতেই কথিকার সার্থকতা — সব চিন্তা শেষ করে দেওয়া নয়।

- যেহেতু কথিকার বিষয়বস্তুর কোন নির্দিষ্টতা নেই, এবং তা নির্ধারণের ভারও লেখকের উপর নয়, সেহেতু লেখককে বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখার ক্ষমতাটি অর্জন করে নিতে হবে। জানা অজানা বিভিন্ন তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে, এ বিষয়েও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন।
- কথিকায় অতিকথন, আলঙ্কারিক ভাষা, উপমা কালিদাসস্য এবং পরিভাষার ব্যবহার পরিত্যাজ্য। মনে রাখতে হবে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র হল সেমিনার হল, আকাদেমি, বিশ্ববিদ্যালয়-জার্নাল; রেডিও তাঁর শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করবে, উজ্জীবিত করবে, শেখাবেও, কিন্তু তা করবে সহজ সরল এবং আন্তরিকভাবে, ঠিক তাঁদের কাছের মানুষটি হয়ে, মঞ্চের বক্তা, ক্লাসের মাস্টারমশাইয়ের মত নয়। কথিকার বাক্যগুলো যাতে স্মরণযোগ্য হয় এদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জটিল এবং কেতাবি বাক্য বুঝতেই অনেকখানি সময় চলে যায়, আর স্মৃতি থেকে ঝরেও পড়ে বড় তাড়াতাড়ি। বিপরীত দিকে আবার একেবারে সাধারণ, সাদামাটা, ছেঁদো কথা তো শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেনই না। এ সঙ্গে এ-কথাটিও মনে রাখতে হবে, কথিকা যেন রসকষবিহীন শুষ্ককথন না হয়ে কিঞ্চিৎ হাল্কা চালে রচিত হয়। শ্রোতারা যেন বলে ওঠেন না, 'কথাগুলো বড় সিরিয়াস, নিরেস, কট্‌কটে'।
- রেফারেন্স, দীর্ঘ উদ্ধৃতি (ইংরেজি বা অন্যভাষা থেকে) ইত্যাদি কথিকাটিকে অহেতুক ভারাক্রান্ত করে দেয়, এগুলো সবসময়ই বর্জন করা উচিত।
- সংখ্যা ব্যবহৃত হলে বা তারিখ, সন ইত্যাদি থাকলে তা বানান করেই লিখতে হবে, নইলে পড়ার সময় ভুল হতে থাকে বারবার। 'দেশের জনসংখ্যা বিরানব্বই কোটি ছুঁয়ে ফেলেছে' বলা সহজ; কিন্তু স্ক্রিপ্টে যদি লেখা থাক ৯২,০০০০০০, তখন মাইক্রফোনের সামনে বসলে চোখে সর্ষে ফুল ভাসতে পারে। ১লা বৈশাখ, ৪৫%, ৭/৩/৯৯, ১/৪, ২.৫০ লক্ষ না লিখে লেখা চাই পয়লা বৈশাখ, পঁয়তাল্লিশ শতাংশ, উনিশ'শ নিরানব্বুইর সাত মার্চ (সাত'ই মার্চ উচ্চারণে সাতী, স্বাতী মার্চ হয়ে যেতে পারে লেখার দোষে), চারভাগের এক ভাগ এবং আড়াই লক্ষ। 'নরসিমারাও-এর সময়ে' না লিখে হবে 'নরসিমারাওয়ের সময়ে'। এগুলো হ'ল স্ক্রিপ্ট রচনার অসাবধানতাজনিত উচ্চারণ ভ্রান্তি ঠেকানোর সাবধানতা।
- আবার নেহাৎই যদি কোন ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে হয় তবে শব্দটি বাঙালিরা সচরাচর যেভাবে উচ্চারণ করেন সেরকমই লেখা উচিত।

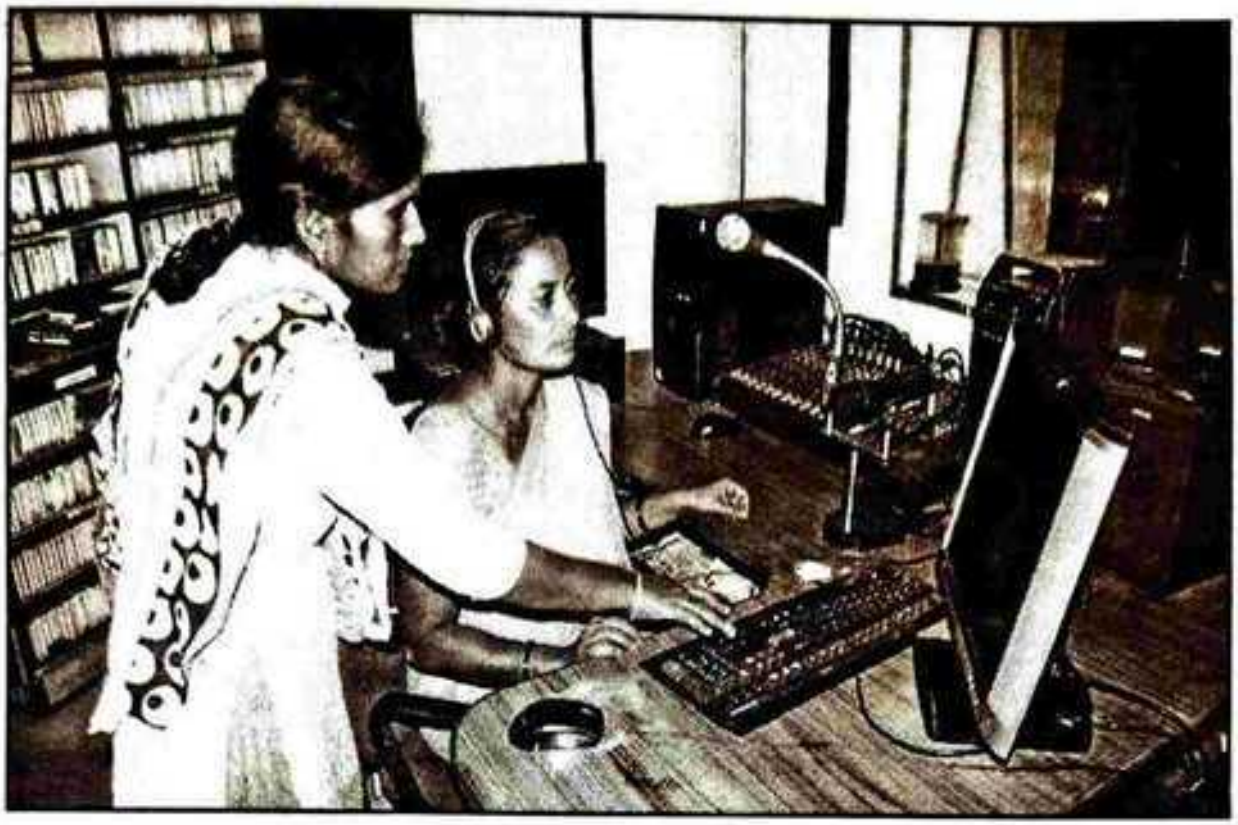

বৈদ্যুতিন মাধ্যম

রেডিওতে কথিকা উপস্থাপনা

Education শব্দটিকে এজুকেশন না লিখে অ্যাডুকেশন বা এডুকেশন লিখতে তো কোন আপত্তি নেই। সাহেবরাও তো কলকাতাকে 'ক্যালকাটা' বলেন এবং লেখেন। Art-gallery কে মুখ ভরে 'আর্ট গ্যালারি' বলতে অসুবিধে কোথায়? সাহেবি কেতায় 'রেফ' বর্জন (silent) করতে গিয়ে একেবারে 'আট' বললে তো বিপত্তি ঘটবেই।

বাংলা প্রিন্ট-মিডিয়া কিছুদিন যাবৎ 'আসাম'কে 'অসম' লিখছে। মূল অসমিয়া উচ্চারণ কিন্তু 'অখহম' (Akhm)। যেহেতু 'আসাম', 'অসম' দুটো শব্দই মূল উচ্চারণটিকে ধরতে পারছে না, সেহেতু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা– সাহিত্য, ইতিহাস, লোকসংস্কৃতিতে মিশে যাওয়া 'আসাম' শব্দটিকে পরিত্যাগ করা কি সঙ্গত, বা আদৌ সম্ভব? শ্রুতিমাধ্যমের লেখকদের এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়ে গেছে।

☞ কথিকায় 'আমি' শব্দটি একেবারে বেমানান। 'আমার মনে হয়; আমার মতে' এসব বাক্য সযত্নে এড়িয়ে চলা প্রয়োজন।

পরিক্রমা, রেডিও-ম্যাগাজিন, ফিচার বা ডকুমেন্টারি

সাধারণতঃ বেতার পরিক্রমাতে রেডিও-র নিজস্ব কর্মীদেরই নিয়োগ করা হয়; তবে সম্প্রতি এসব কাজেও ক্যাজুয়েল কর্মী এবং আমন্ত্রিত স্ক্রিপ্ট রাইটারও নিয়োগ করা আরম্ভ হয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে।

বিভিন্ন ঘটনা, সম্মেলন, প্রদর্শনী, মেলা, সমারোহ, উৎসব, ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাহিত্যানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণই রেডিও পরিক্রমার বিষয়বস্তু। এর উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে স্পট রেকর্ডিং (spot recording), ছোট্ট ইন্টারভিউ (short interview), শব্দ, ধ্বনি এবং ধারা বিবরণী।

কীভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে শ্রোতার সামনে তুলে ধরা যায় এর জন্য লিখিত একটি রূপরেখা সামনে রাখতেই হয়, যদিও কাজে নামলে এর অদল বদল ঘটতে বাধ্য। ধারাবিবরণী তাৎক্ষণিকভাবে দিলেও এর একটা পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। আর ধারাবিবরণী যদি স্টুডিওতে এসে সংযোজন করা হয়, তবে লিখিত বিবরণীই পাঠ করা হয়ে থাকে।

এ ধারাবিবরণী শ্রোতাদের চোখে-দেখার কাজটি করিয়ে নিচ্ছে, তাই এটা যতদূর সম্ভব চিত্রধর্মী হয়, সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন। যা ঘটছে বা ঘটেছে, তা'ই শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরা ভাষ্যকারের কাজ, নিজস্ব অনুভব বা ধারণার প্রকাশ নয়।

রেডিও-ম্যাগাজিন

সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংগীত, নাটক, আবৃত্তি, জানা অজানার জগৎ– এসব কিছু নিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিনোদনমূলক অথচ তথ্যপূর্ণ, শিক্ষণীয় এ রেডিও-ম্যাগাজিন

অনুষ্ঠানটি অনেকটা প্রিন্ট-মিডিয়ার ম্যাগাজিনের মতোই ব্যাপার। যাঁরা বই পড়তে অনিচ্ছুক অথচ কিছু একটা পড়া চাই যেখানে অনেক কিছু জানা যায়, যথেষ্ট বিনোদনও হয়— এদের জন্য যেমন ম্যাগাজিন, ঠিক তেমনি ব্যস্ত মানুষ, যার দীর্ঘ কথিকা, আলোচনা শোনার সময় নেই, মানসিকতাও নেই অথচ কিছু একটা শুনতেই হবে এবং তা উৎকৃষ্ট মানেরও হতে হবে— এরকম শ্রোতাদের জন্যই এ রেডিও-ম্যাগাজিনের উদ্ভব।

আমাদের দেশে টিভি-ম্যাগাজিন যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও, এবং রেডিও-ম্যাগাজিনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, দেশের একমাত্র (ইদানীং অবশ্য অনেক FM রেডিওর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে) বেতার মাধ্যম, 'আকাশবাণী' এ অনুষ্ঠানটির উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দিচ্ছে না — না আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো, না কেন্দ্রীয় সম্প্রচারণ কেন্দ্র। কিন্তু বাংলাদেশ বেতার, জার্মান বেতার তরঙ্গ, ফিলিপিনস সহ দক্ষিণ এশিয়ার আরো কয়েকটি প্রচার কেন্দ্র ছাড়াও বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা অনুষ্ঠানে রেডিও-ম্যাগাজিন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

আগামী দিনগুলোতে 'আকাশবাণী' যদি এ অনুষ্ঠানের দিকে মনোযোগী হয়, তবে রেডিও অনুষ্ঠানের মান বাড়বেই।

ডকুমেন্টারি বা ফিচার

যদিও আকাশবাণীতে ঠিক রেডিও-ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটি নেই তবু রেডিও-ম্যাগাজিনের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আরেকটি অনুষ্ঠান এখানে রয়েছে যাকে বলা যেতে পারে রেডিও-ডকুমেন্টারি। আকাশবাণী, সাধারণত 'ফিচার' শব্দটিই ব্যবহার করে। ব্যক্তি, ঘটনা, ইতিহাস, শিল্প সংস্কৃতি, উৎসব, প্রতিষ্ঠান, কোন বিশেষ জনপদ, জনগোষ্ঠী, শিল্পকেন্দ্র, শ্রমিক, পর্যটন কেন্দ্র — ইত্যাদি হাজারটা বিষয় নিয়েই ফিচার করা যায়।

স্পট-রেকর্ডিং, সাক্ষাৎকার, ধারাভাষ্য, কথা শব্দ ধ্বনি — এ নিয়েই রচিত হয় রেডিও ফিচার।

রেডিও-ম্যাগাজিনের মত অনেকটি বিষয় না নিয়ে একেবারে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ই রেডিও-ফিচারের উপজীব্য।

একটি ফিচারের স্ক্রিপ্ট তৈরি করার পেছনে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা বা Research, অনুষ্ঠান-রূপায়ণে কল্পনা শক্তির প্রয়োগ, এবং শ্রোতাদের মনঃস্তত্ব অনুযায়ী অনুষ্ঠানটির প্রস্থনা। এখানে নিষ্ঠা এবং কল্পনা, টেকনিক্যাল বুদ্ধি এবং সৃজনশীলতা — দুটোরই সংমিশ্রণ চাই।

স্ক্রিপ্ট-লেখককে সচেতন থাকতে হবে যেন তাঁর ফিচারটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা-কর্ম হয়ে না ওঠে। আবার সে সঙ্গে এও দেখতে হবে যেন কাজটি একেবারে সাদামাটা অতি উচ্ছ্বাসপূর্ণ কিছু-কথা, কিছু-সংগীত, ধ্বনি মিশ্রণে আলেখ্য হয়েও না

দাঁড়ায়। প্রতিটি অনুষ্ঠান পরিকল্পনার সময় চোখের সামনে টার্গেট শ্রোতাকে রাখতে হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও টার্গেট বহির্ভূত শ্রোতাকে উপেক্ষা করার কথা নয়, বরং তাঁদের দলে টানার একটা লক্ষ্যও থাকা উচিত এ পরিকল্পনায়।

আমরা এ কথাগুলো মনে রেখে 'ফিচার' রচনা পদ্ধতির একটি রূপরেখা তৈরি করার চেষ্টা করব :

১. টাইটেল মিউজিক : রেডিও-ফিচারের টাইটেলে কণ্ঠসংগীতের প্রয়োগ সুন্দর হয় না, তাই এখানে যন্ত্রসংগীতের প্রয়োগই যথাযথ। বাংলাদেশের চাষ-আবাদ অনুষ্ঠান বা আকাশবাণীর চাষ-আবাদ অনুষ্ঠানে গানের প্রয়োগ রয়েছে, কিন্তু এ অনুষ্ঠানের শৈল্পিক মূল্যকে কখনই আমরা বিচার করতে বসিনা।

টাইটেল মিউজিক পরিকল্পনায় যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার প্রয়োজন। সাহিত্য অনুষ্ঠানে বাঁশির সুর, সেতারের ঝঙ্কার বা জলতরঙ্গের টুংটাং যেমন মানানসই, তেমনি বিজ্ঞান জগতে মানানসই হয় চড়া ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সুর; ক্রীড়াজগতে সেতারের চাইতে তবলার লহরা একেবারে যথাযথ টাইটেল মিউজিক হয়ে যায়, আর 'জানা অজানার জগতে' অদ্ভুত সব শব্দ-ধ্বনির ঐকতান (exotic sound), তাও আবার যদি হয় 'echoed', তা শুরুতেই শ্রোতার মন কেড়ে নেবে।

টাইটেল মিউজিকের দায়িত্ব হল ফিচারের থিমকে 'ইনট্রোডিউস্' করে দেওয়া। চা-বাগিচার শ্রমিকদের উপর ফিচারে সাঁওতালী বাঁশি আর মাদলের তাল মুহূর্তে শ্রোতাদের টেনে নিয়ে যাবে 'একটি কুঁড়ি দুটি পাতার' জগতে; কারাগারের বন্দিদের উপর তৈরি ফিচারের টাইটেল-মিউজিক যদি হয় চড়া সুরে বেহালার আর্তনাদ এবং এ সঙ্গে ভাষ্যকারের প্রতিধ্বনি-যুক্ত (echoed) উচ্চারণ, অমনি শ্রোতাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে কারাগারের লৌহ কপাট।

২. শব্দ ও ধ্বনি : অদেখা মানুষজন, ঘরবস্তি, কারখানা, নির্জন উপত্যকা, পর্যটন কেন্দ্র কিংবা ঐতিহাসিক স্থানকে দৃশ্যমান করতে হ'লে শুধু মৌখিক ভাষাতে কাজ হবে না, সাহায্য নিতে হবে শব্দ ও ধ্বনির অর্থাৎ sound-effect এর।

রেডিওর সাউণ্ড-এফেক্ট দু'ধরনের– একটি হ'ল প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক (natural); আরেকটি হ'ল কৃত্রিম (artificial)। রেডিওর প্রয়োজন হয় দু'ধরনের সাউণ্ড-এফেক্ট-এরই।

বিষাদের ঘটনা বোঝাতে natural sound অর্থাৎ মানুষের কান্নার চাইতে কৃত্রিম শব্দের ব্যঞ্জনা অর্থাৎ artificial suggestive sound effect অনেক সময় অসাধারণ ক্রিয়া করে। তা-ছাড়াও উদ্ভট ঘটনা, হাসির দৃশ্যে কৃত্রিম শব্দের প্রয়োগ অট্টহাসির চাইতেও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

শব্দ ও ধ্বনির প্রয়োজন হয় 'অ্যাকশন' বোঝানোর জন্যও; উত্তেজনা, অন্তর্কলহ, বিস্ময় — এসব অভিব্যক্তি নিছক শব্দ প্রয়োগে (sound-effect) যত সহজে মূর্ত করা

যায়, কথা দিয়ে তা হয় না। প্রতিধ্বনি বা echoed voice এর মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত বিষয়, যন্ত্রমানব, ঈশ্বর, ভূতপ্রেত ইত্যাদিকে দৃশ্যমান করা সহজ। Locale colour অর্থাৎ স্থানিক চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে সাউন্ড এফেক্টের জুড়ি মেলা ভার, বিশেষ করে শ্রুতিমাধ্যমে। কর্ণাটকি সংগীতের একটু আভাস দিলেই শ্রোতারা বুঝে নেবেন, দক্ষিণ ভারতীয় জীবন বা মানুষজনের প্রসঙ্গ এসে গেছে; তেমনি বিহুর সুরের টুকরো ছড়িয়ে দিলেই শ্রোতারা বুঝে নেবেন লোকেশন আসাম।

৩. ধারাভাষ্য / কথা : একটি ফিচার খাড়া করতে হলে — তা রেডিওর হোক্ বা টিভিরই হোক্ — এজন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে স্ক্রিপ্ট-লেখককে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় রিসার্চ-ওয়ার্কটি করে নিতে হবে। এ গবেষণাটি অ্যাকাডেমিক নয়, শৈল্পিক; যদিও অ্যাকাডেমিক শৃঙ্খলাবোধ এখানে থাকতেই হবে। এরপরই আসবে ভাষ্য রচনার পালা।

ভাষ্য রচনায় একটানা বক্তৃতার কোন স্থান নেই। এক সঙ্গে এক মিনিট কথা (spoken word) হলেই শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে, তাই বিরতি (pause) থাকতে হবে যথেষ্ট এবং এ বিরতিগুলো সাউন্ড এফেক্ট এবং নৈঃশব্দ্য (এটা একটা সাউন্ড) দিয়ে ভরে দিতে হবে।

ফিচারের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের নিজস্ব কণ্ঠস্বর ইত্যাদির স্পট-রেকর্ডিংও থাকতে হবে। বিষয়বস্তু যাই হোক্ না কেন, লেখককে একটি সুপরিকল্পিত আদি-মধ্য-অন্ত্য (beginning-middle-end) সম্বলিত আঙ্গিকে বেঁধে নিতে হবে ফিচারটিকে এবং শৈল্পিক দক্ষতায় সমস্ত বিষয়টিকে একটি ক্লাইম্যাক্স-এর (climax) দিকেই নিয়ে যেতে হবে। এতে ফ্ল্যাশ-ব্যাক্, ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড (Flash back, Flash forward) পদ্ধতির প্রয়োগও সম্ভব।

প্রয়োজনবোধে দু-একটি ঘটনাকে স্টুডিওতে enact করিয়ে নেওয়াও চলে। টিভি-ডকুমেন্টারিতে এ প্রথাটি ব্যাপকভাবে চালু আছে; এমনকি জীবনীমূলক ডকুমেন্টারিতে জীবন্ত ব্যক্তির স্থলেও পেশাদার অভিনেতা/অভিনেত্রী দিয়ে ঘটনাসমূহ enact করিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

রেডিও ফিচার-এর স্ক্রিপ্ট-লেখককে একই সঙ্গে তত্ত্ব ও প্রয়োগ — দুটো দিকেই সচেতন হতে হবে। স্ক্রিপ্টটি শুধু লিখেই তাঁর সব কাজ শেষ নয়, ফিচারটি যাতে যথাযথ ভাবে প্রস্থিত বা রেকর্ডিং হয়, ডাবিং এর কাজ, শব্দমিশ্রণ ও সমতা রক্ষা (sound mixing and balancing) ঠিক মত হয়, এ জন্য সমস্ত খুঁটিনাটি টেকনিক্যালিটিসও তাঁর স্ক্রিপ্ট-এ থাকলে ভাল।

যেহেতু আবহসংগীত রেডিও ফিচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেহেতু লেখকের সংগীতের (দেশি, বিদেশি, উচ্চাঙ্গ এবং লোক) উপরও প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকাটা একান্ত জরুরি।

রেডিও নাটক

রেডিও-নাটক শুধুমাত্র ধ্বনি নির্ভর নাটক। মঞ্চনাটকের যে দিকগুলো এখানে শব্দ ও ধ্বনি (words and sound effects) দিয়ে পূরণ করতে হয় তা হ'ল :

ক) **দৃশ্য/লোকেশন অর্থাৎ স্থান :** মঞ্চ নাটকে আলোক, সিন-সিনারি, সেট (set)-এর সাহায্যে তা দেখানো যায়, কিন্তু রেডিও-নাটকে আবহসংগীত, সাউন্ড-এফেক্ট এবং চরিত্রদের সংলাপেই তা ফুটিয়ে তুলতে হয়।

খ) **কাল :** সময় বোঝানোর জন্য মঞ্চনাটকে দৃশ্যবলী, গাছপালা, আলো ইত্যাদি অনেক কিছুই উপস্থাপন করা যায়; কিন্তু রেডিও নাটকে এটাও শব্দ-ধ্বনি-সংলাপের উপর নির্ভরশীল।

গ) **চরিত্র :** মঞ্চনাটকের পাত্র পাত্রীরা কোন্ বয়সের, কী-চেহারার, কী পোষাক পরেছে, অঙ্গভঙ্গি কী রকম, এ সবকিছু দর্শকরা দেখতে পাবেন, কিন্তু রেডিও-নাটকে সংলাপ দিয়েই সব কিছু শ্রোতাদের বোধগম্য করাতে হবে।

এ অবস্থায় আমরা এটা ধরে নিতে পারি — রেডিও-নাটক শুধুই কথা এবং কথা, অর্থাৎ মঞ্চ নাটকের চেয়ে রেডিও নাটকে 'কথার বোঝা' অনেক বেশি। কিন্তু আসলে, এটা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। রেডিও-নাটকে 'কথা' মঞ্চনাটকের চেয়ে মোটেই বেশি নয়।

যদিও 'কথা' এখানে একমাত্র না হলেও প্রধান উপাদান, তবুও রেডিও-নাটক আগাগোড়া কথার ফুলঝুরি নয়। স্থান-কাল-পাত্র কিংবা নাটকের কাহিনীর উপস্থাপনা মূলতঃ সংলাপের উপর নির্ভরশীল, অতএব সংলাপ প্রয়োজনের চাইতে একটু অতিরিক্ত— এ-কথা ভাবার কোন কারণই নেই। এখানে নাট্যকারের হাতে কথা ছাড়া আরো কয়েকটি উপাদান রয়েছে, তা হ'ল : মাইক্রোফোন, সাউন্ড-এফেক্ট, সংগীত, সাউন্ড-রেকর্ডিং এবং স্বর মডিউলেশন (modulation)। অর্থাৎ রেডিও-নাটক রচনা শুধুমাত্র মৌখিক বচনের অক্ষর বিন্যাস নয়, শব্দধারণ, শব্দমিশ্রণ, শব্দ-সৃজন, শব্দ-প্রক্ষেপন—এসব কিছুই রেডিও-নাটক রচয়িতার কর্মক্ষেত্র। অর্থাৎ সংলাপের সঙ্গে শব্দ ও ধ্বনির ভূমিকাও রেডিও-নাটকে যথেষ্ট, এবং এজন্যই রেডিও-নাটক মোটেই 'কথা নির্ভর' নয়।

মঞ্চনাটকের সঙ্গে রেডিও-নাটকের একটি প্রধান পার্থক্য হল মঞ্চে কথা কিছু বেশি হলেও শ্রোতাদের কর্ণপীড়ার বা ear fatigue এর সম্ভাবনা নেই কারণ চরিত্রদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এবং অ্যাকশন, মঞ্চক্রিয়া এ fatigue-এর সম্ভাবনাটি কমিয়ে দেয়। কিন্তু রেডিওতে বেশি কথা শ্রোতাকে সহজেই ক্লান্ত করে দেয়।

রেডিও-নাটকের সংলাপও হবে একেবারে সংক্ষিপ্ত, এবং ভাঙাভাঙা, যেমন সচরাচর আমরা কথা বলি আর কি, অসম্পূর্ণ, কাটা কথা, কিছু প্রকাশ হয়, কিছু থাকে উহ্য। মঞ্চ এবং রেডিও-নাটকের দুটো সংলাপ পাশাপাশি রেখেই ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করা যাক্ —

মঞ্চ নাটক :

কী গো, সাত সকালেই থলে হাতে বাজারে চললে। কেউ আসবে নাকি আজ, তোমার বাসায়? শ্বশুর বাড়ির কেউ? যাও, যাও, বড় মাছের মাথাটা থলেয় পু'রো —।

রেডিও নাটক :

কী? বাজারে ...? এত সকালে? কেউ আসছে? শ্বশুর বাড়ীর? যাও বড় মাথাটাই এনো।

মঞ্চে 'সাত সকালেই থলে হাতে' কথাটির সঙ্গে রয়েছে মুখের ভঙ্গি, চোখের ভঙ্গি, হাতের কাজও। 'বড় মাছের মাথা' বলতে বলতে হাতও তা দেখিয়ে দিচ্ছে; থলের ভেতর মাছের মাথাটি ঢোকানোর ভঙ্গিটাও এ শব্দগুলো উচ্চারণের সঙ্গে রয়েছে; — অতএব এখানে শ্রোতা-দর্শকের কান কথার বোঝা সইতে পারছে, কিন্তু রেডিওর শ্রোতার শ্রবণযন্ত্র এত কথার ভার সইতে পারবে না।

রেডিও-নাটকে Flash back, Flash forward-এর অঢেল সুযোগ; unity of time and place রক্ষার সমস্যা নেই। ফলে নাট্যকার কল্পনাশক্তির প্রয়োগে যথেষ্ট স্বাধীন; কিন্তু এখানেই তাঁর সাবধানতার প্রয়োজন। ঘনঘন লোকেশন বদল করলে নাটক দুর্বল হতে বাধ্য। সময়ও যদি 'out of joint' অর্থাৎ বন্ধনহীন, তবে নাটক সার্থকতা লাভ করতে পারবে না।

আর Flash back করে পাঁচ বছর পেছনে চলে গেলে পনেরো বছরের অর্থাৎ টিন-এজার নায়িকাটি যে দশমবর্ষীয়া বালিকা হয়ে যাবে এবং এর ফলে তার সংলাপের ভাষা, ম্যানারিজম সব কিছু বদলে যাবে, এ সচেতনতা না থাকলে দশম বর্ষীয়া বালিকাটির পাকা কথা নাটকটিকে মাটি করে দেবে– এ কথাটিও লেখককে মনে রাখতে হবে। তাছাড়াও চরিত্রের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষাও পাল্টে যাবে — এ কথাটি মনে না রাখলে নাটক নষ্ট হবেই। অর্থাৎ পরিস্থিতির (situation) পরিবর্তনের ফলে একই চরিত্র ভিন্ন ধরনের ভাষায় (uncharacteristic ways এ) কথা বলবে– এ দিকে নাট্যকারের সচেতন থাকা প্রয়োজন। শেক্সপিয়ারের Antony and Cleopatra নাটকের শেষ পর্বে অ্যান্টনি হঠাৎ ভিন্ন সুরে উচ্চারণ করে ওঠে : 'খুলে নাও, হে এরোস, (আমার এ) অস্ত্র-আবরণ, দিবসের সুদীর্ঘ সব কাজ শেষ হ'ল। এখন ঘুমোতে হবে।' (Unaram, Eros, the long day's task is done, and we must sleep, Act IV, Sc, XIV)।

এ অ্যান্টনি এখন নতুন মানুষ। যুদ্ধবাজ, কামুক ইন্দ্রিয় পরায়ণ অ্যান্টনি নয়। ক্লিওপেট্রার ভালোবাসা তাঁকে নবজন্ম দিয়েছে, মৃত্যুবরণ করার আগে সে এখন নতুন ভাষায় কথা বলছে।

প্রতিটি সংলাপে যদি স্থান-কাল বুঝিয়ে দেবার প্রয়াস থাকে, সেটা হবে চরম রসভঙ্গের কারণ। তাই প্রয়োজন 'সাউন্ড এফেক্ট' এর। মধ্যরাত্রি বোঝাতে ঝিঁঝির ডাক,

কুকুরের বিলাপ, নিশাচর পাখির ডাক, কিংবা নৈঃশব্দ্যের এফেক্ট, প্রতিধ্বনি — এসব রয়েছে। রেলগাড়ির সঙ্গে রাত্রির আপাতদৃষ্টিতে কোন সম্পর্ক নেই — কিন্তু দূর থেকে কাছে এসে আবার মিলিয়ে যাওয়া (fade in and fade out) রেলগাড়ির হুইসেল্ বড় নিবিড়ভাবে গভীর রাতের এফেক্ট আনে। এইভাবে ধ্বনি, শব্দের প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা রেডিও-নাটক রচনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নাট্যকার শুধু কাহিনী খাড়া করে, চরিত্র চিত্রণ করে, ডায়লগ লিখে দিলে তাঁর কাজটি হবে ঠিক পঞ্চাশ ভাগ, বাকি পঞ্চাশ ভাগ রয়ে যাবে অসম্পূর্ণ।

রেডিও-নাটক সাধারণত ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়সীমাতেই নির্দিষ্ট থাকে, সেটা বড় জোর ষাট মিনিটে যেতে পারে, এর বেশি তো নয়; সুতরাং এ নাটকে অনেকগুলো চরিত্র ও ঘটনা উপস্থাপনা করা সম্ভব নয়। এক একটি sequence ('দৃশ্য' বলা যাবে না) দু' তিন মিনিট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে হবে। রেডিও-নাটকের অন্তর্বয়নটি যেন অনেকটা প্রিন্টমিডিয়ার ছোটগল্পের মতোই। প্রায়শই ছোটগল্পকেই রেডিও-নাটকের প্লট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। বিবিসি-লন্ডনের রবিবারের নাটক 'দ্য প্লে অব দ্য উইক' (ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায়) কিন্তু এক ঘন্টার নাটক। এ অনুষ্ঠানে বিশাল আকারের উপন্যাস — টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পিস', দস্তয়েভস্কির 'দ্য ক্রাইম এণ্ড পানিশম্যান্ট', ডিকেন্সের 'পিকউইক পেপার্স' থেকে হেমিংওয়ের 'এ ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস', 'ওল্ডম্যান এণ্ড দ্য সি', বার্নাড শর 'পিগমিলিয়ন', লরেন্সের 'সনস এণ্ড লাভার্স'— এর যেমন নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে, তেমনি ব্রাউনিঙের 'মাই লাস্ট ডাচেস' এর মত কবিতা, অস্কার ওয়াইল্ডের 'দ্যা হ্যাপি প্রিন্স' এর মতো ছোট গল্পের নাট্যরূপও প্রচারিত হয়েছে। রেডিও নাটকে কথা, শব্দ, গতি, রেকর্ডিং, মডিউলেশন এবং স্ক্রিপ্ট রচনার অন্যসব নৈপুণ্যের জন্য বিবিসির এ নাটকগুলো রেডিও-নাটক রচয়িতাদের কাছে একটি নির্ভরযোগ্য মডেল হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে।

ফ্যান্টাসি বা অতিপ্রাকৃত কাহিনী রেডিও-নাটকে যত সুন্দরভাবে মূর্ত হয়, মঞ্চনাটকে তার সমস্ত আধুনিক উপকরণ নিয়েও তা হয় না। পরি, ভূত প্রেত, অলৌকিক প্রাণী, যন্ত্রমানব, যন্ত্রদানবরা, রেডিও-নাটকের চরিত্র হিসেবে বড় মানানসই। কথা-বলা-প্রাণীরাও রেডিও-নাটকে খুব স্বচ্ছন্দ এবং চিত্তাকর্ষক।

তবে সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়েও নাটক রচিত হয়। আকাশবাণীর কয়েকটি অতিবিখ্যাত নাটকের সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক নাটক।

কল্প-বিজ্ঞান, ডিটেকটিভ নাটক রেডিও-তে খুব সার্থক হয়; কিন্তু এজন্য টেকনিক্যাল জ্ঞানের সঙ্গে সৃজনশীলতার সংমিশ্রণও প্রয়োজন। সত্যজিৎ রায়ের গল্প নিয়ে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের নাটক 'সেপ্টোপাসের ক্ষিধে' একটি দুর্ধর্ষ প্রযোজনা।

রেডিও নাটকে ভাষা এবং উপভাষার প্রয়োগ একটি স্বতন্ত্র আলোচনারই দাবি রাখে, যদিও বর্তমান আলোচনায় খুব সংক্ষেপেই এদিকে আলোকপাত করা হবে। নাটকে

'locale colour' প্রতিষ্ঠিত করতে, নাটকটির বিশ্বাসযোগ্যতা (authenticity) স্থাপন করতে, কিংবা নাটকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে, পরিস্থিতি অনুযায়ী নাটকটিতে লিরিক্যাল বা exotic টোন আনতে হলে উপভাষার প্রয়োগ খুবই আবশ্যক।

আকাশবাণীর কলকাতা, শিলিগুড়ি, শিলচর, আগরতলা কেন্দ্র কিংবা বাংলাদেশ রেডিও থেকে প্রচারিত নাটকে বিভিন্ন উপভাষার প্রয়োগ শ্রোতাদের চমকিত করেছে, এখনও মাঝে মাঝে করে। চা বাগিচার ভাষা, দেহাতি ভাষা, খনি শ্রমিকের মিশ্র ভাষা, অপরাধ জগতের ভাষার প্রয়োগ রেডিও-নাটককে জীবন্ত করে তোলে। তবে লেখককে এ বিষয়েও সচেতন থাকা প্রয়োজন, দেশজ বা আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ যেন কখনো'ই হাস্যকর বা আরোপিত কিংবা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট না হয়, এবং যেন একটি গৎ বাঁধা ছকের মধ্যে পড়ে না যায়। বাংলা নাটকে সিলেটি উপভাষার অসংযত, যথেচ্ছচার প্রয়োগ নাটকটিকে বিনষ্ট করে দিতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে দিয়েছেও, কিন্তু চিত্রভানু ভৌমিকের হাতে এ উপভাষায় রচিত 'লালমোহনের সংসার' ১৯৯২ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ রেডিও-নাটকের খেতাব অর্জন করে নিল।

এ-প্রসঙ্গে কথাটিও মনে রাখতে হবে যে ট্যাক্সি ড্রাইভার হলেই ভাঙা-পাঞ্জাবি, পুলিশ হলেই হিন্দি ভাষার সংলাপই তাঁর মুখে দিতে হবে এরকম ফর্মুলা থেকে বেরিয়ে আসাই ভালো। শিল্পশৈলীর প্রশ্ন ছাড়াও এখানে জাতিবিদ্বেষের একটা প্রকাশও যেন ঘটে যায় এটা মনে রাখা চাই।

রেডিও নাটকের সব কটি দিকের উপর সামগ্রিকভাবে আলোচনা এ রচনার উদ্দেশ্য নয়, তাই রেডিও-নাটক রচনার মাত্র কয়েকটি দিকের উপরই আলোচনাটিকে সীমিত রাখা হয়েছে এবং শেষ করার আগে আমরা এর শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং এর উপর কয়েকটি কথা বলব।

রেডিওর স্পর্শকাতর যন্ত্র হল মাইক্রোফোন, এবং এর যথাযোগ্য শৈল্পিক ব্যবহার একটি নাটককে সার্থক করে তুলতে সহায়ক করে, বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে নাটক-লেখকের আওতায় না থাকলেও লেখক তার স্ক্রিপ্টে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দেশ লিখে দিতে পারেন; কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি নাট্যকার শুধু কাহিনী খাড়া করে, ডায়লগ লিখে দিলে তাঁর কাজটি হবে ঠিক পঞ্চাশ ভাগ ...।

কণ্ঠস্বরের মডিউলেশন — ফিস্‌ফিস্ কথা থেকে উচ্চকণ্ঠে আর্তনাদের রেঞ্জ কীভাবে, কতটুকু সীমারেখার মধ্যে রাখা হবে, এটা নির্ধারণের কাজ লেখকেরই। 'অফ-মাইক সিচুয়েশন', দূর থেকে কাছে আসা শব্দ, খোলা ময়দানে এবং ড্রয়িংরুম-সিচুয়েশনে শব্দ রেকর্ডিং কীভাবে করা হবে, এটা গভীর চিন্তনের প্রয়োজন, প্রয়োজন প্রখর ডিটেলস-সচেতনতা এবং টেকনিক্যাল বুদ্ধিরও। এ নিয়ে দৃষ্টান্ত সহযোগে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই; তবুও সত্তর দশকে শাঁওলী মিত্র অভিনীত একটি নাটক রেকর্ডিং-এর প্রসঙ্গটি এখানে খুবই অর্থবহ। নাটকটিতে একটা সিচুয়েশন ছিল, দশ বারো বছরের একটি মেয়ে সাঁতার প্র্যাকটিস্ করছে পুকুরে, পাড়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ

দিচ্ছেন ইনস্ট্রাকটার, মেয়েটি চ্যাঁচাচ্ছে, 'আর পারছি না, ডুবে যাব' ... ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু রেকর্ডিং শুনে বোঝা যাচ্ছে না যে মেয়েটি পুকুরের মধ্যিখান থেকে সংলাপ বলছে — অর্থাৎ, স্টুডিও-রেকর্ডিং-এ জলের এফেক্ট আসছে না; নাটকের বিশ্বাসযোগ্যতাও স্থাপিত হচ্ছে না। অবশেষে এক গামলা জলের সামনে মুখ নামিয়ে উচ্চারিত কথাগুলো রেকর্ডিং করে দেখা গেল সত্যিই জলের এফেক্ট এসে গেছে (ঘটনাটি ছবি সহ 'দেশ' পত্রিকায় আলোচিত হয়েছিল এবং এটাও উল্লেখ থাকুক এ আইডিয়াটি এসেছে আকাশবাণীর কেন্টিনবয়ের মাথায়)। বিবিসির 'দ্য ওল্ডম্যান এণ্ড দ্য সি' তেও সান্টিয়াগোর দীর্ঘ আত্মকথনে সমুদ্রের স্বর দিয়েছিল বিশেষ মাত্রা। শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের 'চেম্মিন' নাটকেও (জাতীয় কার্যক্রমে প্রচারিত) এ ব্যাপারটির প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছিল, শ্রোতাদের স্মরণে থাকতে পারে। এ হচ্ছে এক ধরনের সিচুয়েশন, এখানে রেকর্ডিং-এ প্রযোজক-পরিচালক যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও সৃজন ক্ষমতার প্রয়োগ দেখাতে পারেন; কিন্তু সাদামাটা সিচুয়েশনে সমস্যাটা অনেক বেশি। যেমন, গৃহস্বামী বসে আছেন ভেতরের ঘরে, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। গৃহভৃত্য আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলছে, গৃহস্বামী কথা শুনছেন কিন্তু বুঝতে পারছেন না আগন্তুকটি কে এবং কী বলতে চাইছে — এ পুরো সিচুয়েশনটিকে গৃহস্বামীর perspective-থেকে ফুটিয়ে তুলতে হলে রেকর্ডিং কীভাবে হবে তা যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ই। এবং এ কাজটি লেখকেরই।

রেডিও-নাটক লিখতে হ'লে লেখককে নিজের কাহিনীটি রচনা করতে হবে — এমন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। একটি গল্পও না লিখে বা কাহিনী রচনা না করেও একজন ব্যক্তি সফল রেডিও নাট্যকার হতে পারেন, যদি অন্য লেখকদের রচনার মধ্যে রেডিও-নাটকের সম্ভাবনাগুলো সঠিকভাবে আবিষ্কার করতে পারেন এবং নিজস্ব সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি এবং টেকনিক্যাল বুদ্ধির প্রয়োগে, যাকে বলা যেতে পারে প্রকৃত 'রেডিও-জেনিক' (Redio-genic) স্ক্রিপ্ট লিখে উঠতে পারেন।

তবে অন্যের গল্পের নাট্যরূপ দিলে মূল লেখকের লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক; 'কপি রাইটে'র মেয়াদ চলে গেলে, অর্থাৎ লেখকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেলে এরও প্রয়োজন নেই।

আমরা রেডিও নাটক রচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিই:

- রেডিও-নাটকের অন্যতম উপাদান 'কথা' হলেও এতে মঞ্চ-নাটকের চেয়ে কথা বেশি নয়।
- রেডিও-নাটকের সংলাপ খুবই ছোট্ট, ভাঙা ভাঙা এবং স্বাভাবিক।
- রেডিও-নাটকের কথা ব্যবহারে যতটুকু যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই হওয়া প্রয়োজন শব্দ এবং ধ্বনির প্রয়োগে। সাউন্ড-এফেক্ট, মাইক্রোফোনের ব্যবহার, মডিউলেশন ইত্যাদি সবকিছুরই সবকিছুরই নির্দেশ লেখকের রচনার আওতার ভেতর।

- শব্দ ও ধ্বনি প্রয়োগে পরীক্ষা নিরীক্ষাও রেডিও-নাটক রচয়িতার অন্যতম কর্ম।
- কল্প বিজ্ঞান, রহস্য রোমাঞ্চ, রূপকথা কিংবা মনস্তত্ত্ব বিষয়ক নাটক রেডিও-র পক্ষে খুবই উপযোগী।
- রেডিও-নাটকে এক একটা sequence দুই থেকে পাঁচ মিনিটের বেশি না হওয়াই কাম্য।
- Unity of time & place-এর সমস্যা রেডিও-নাটকে যদিও নেই, তবুও প্লটটিকে নিটোলভাবে বাঁধতে হলে ঘনঘন লোকেশন না বদলানোই ভালো, কারণ এতে Unity of action বিঘ্নিত হয়।
- প্লটটি বিস্তৃত না হয়ে ছোট্ট হওয়াই প্রয়োজন এবং চরিত্র সংখ্যাও সীমিত হওয়া চাই।
- উপন্যাস বা বড়গল্প কিংবা মঞ্চ নাটক না নিয়ে ছোটগল্প থেকেই রেডিও-নাটকের প্লট খুঁজে নেওয়া ভাল। তবে নিজস্ব প্লট হলে তো ভালই। এন্টি-প্লট, এন্টি হিরো গল্পও রেডিও-নাটকে দারুণ জমে ওঠে।

টিভি-স্ক্রিপ্ট রচনা

প্রাসঙ্গিক কথা : টিভি এবং লেখক

আমরা জেনেছি রেডিওর কাজ হ'ল শব্দ ও ধ্বনির মাধ্যমে অদৃশ্যকে শ্রোতার মনশ্চক্ষে দৃশ্য করে তোলা; অর্থাৎ, রেডিওতে চোখে দেখার কাজটিও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই করিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু টিভি একেবারে প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যকে উপস্থাপন করে ফেলে, এবং সে সঙ্গে রেডিওর উপাদান, শব্দ ও ধ্বনিকেও কাজে লাগায়। টিভির দর্শক একই সঙ্গে শ্রোতা'ও। তবুও এরা আলাদা, এদের ভাষাও আলাদা, যদিও এরা এত কাছাকাছি।

টিভি যখন শ্রোতাদের 'দর্শক' বানিয়ে ফেলছে, তখন এতে কথা ও শব্দের কী ভূমিকা হবে বা কতটুকু হবে, সেটা বিস্তর চিন্তা ভাবনারই কথা। তবে যতই 'দৃশ্য সুখ' থাক, যতই 'দেহ স্পষ্ট' হোক্, সেই 'একটু বেশি কথা বলা' মাধ্যমটির 'কথা বলা' গুণটি না থাকলে দৃশ্য বৃথা, অসম্পূর্ণ — যেমনটি হতো নিষ্প্রাণ নীরব-চিত্রের (silent movies-এর) ক্ষেত্রে। প্রাক্-টকি (pre talkie)-র যুগেও নৈঃশব্দ্যকে ভরে তোলা হতো আবহসংগীত দিয়ে।

রেডিও-তে যেমন কতটুকু শোনানো হবে এবং কী-ভাবে, তা স্থির করছে মাইক্রোফোন, তেমনি টিভিতে কতটুকু দেখানো হবে, কীভাবে দেখানো হবে তা স্থির করছে ক্যামেরা। কিন্তু মাইক্রোফোনের পেছনে যেমন রয়েছে একজন মানুষের

চিন্তা-কল্পনা-অনুভব এবং বলা বাহুল্য, শ্রবণ-যন্ত্র, ঠিক তেমনি সচল-ক্যামেরার পেছনেও সতত চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকেন একজন মানুষ (পরিচালক কিম্বা ক্যামেরাম্যানও ওই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত), এবং এ মানুষটি আর কেউ নয়, লেখক, অর্থাৎ স্ক্রিপ্ট-রাইটার।

টিভি-র অনুষ্ঠানে সরাসরি দর্শকদের সামনে উপস্থিত হ'ন বক্তা, অভিনেতা, শিল্পী কিংবা ঘোষক এবং তাঁকে দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে সরাসরি বিনিময় করতে হয়। এখানে কোন মধ্যস্থের স্থান নেই, যেমন রয়েছে রেডিওতে।

রেডিওতে হাতে কাগজ নিয়ে কথা বলা চলে, আবৃত্তি চলে, অভিনয়ও চলে; চলে প্রায় সব কিছুই। কিন্তু টিভি-তে আলোচনায় বসলে কি বার বার কাগজ দেখে পড়লে চলে? নিছক সাদামাটা ঘোষণাগুলোই যদি পর্দার দিকে সরাসরি না চেয়ে বলা হয়, তা-ও দর্শকদের বিরক্তির কারণ হয়। অর্থাৎ স্ক্রিপ্ট-এর প্রত্যক্ষ প্রয়োগ টিভি-তে চলবে না, যেমন চলে রেডিওতে। কিন্তু টিভিতে স্ক্রিপ্টের প্রত্যক্ষ প্রয়োগও প্রযুক্তির সহায়তায় সম্ভব হয়ে গেছে। অর্থাৎ টিভিতে লেখকের ভূমিকা গৌণ না হয়ে লেখকের আসনটি আরও শক্ত হয়েছে নতুন প্রযুক্তির বলে।

কীভাবে, এ প্রশ্নটি এখন অনিবার্য।

একটি দশকও হয়নি ঘটনাটির, আমরা হঠাৎই আবিষ্কার করলাম, যে টিভির সংবাদ পাঠক/পাঠিকারা আগের মত আর কাগজ দেখে খবর পড়েন না; অনেকেই অবাক হলেন কী-করে গোটা নিউজটি নিখুঁতভাবে মুখস্থ বলে দিচ্ছেন এরা; সাধারণ দর্শক-শ্রোতারা বোধ হয় ধরেই নিয়েছেন যে ওঁরা শ্রুতিধর। কিন্তু আসল ব্যাপারটি যে অন্য। আজকাল নিউজ-রিডার বা অ্যানাউনসারের চোখের সামনেই মনিটারে স্পষ্ট অক্ষরে স্ক্রিপ্ট দেখানো হয়, ক্যামেরাটি ঠিক এর উপর থেকে মনিটারটিকে বাদ দিয়ে (exclude করে) ছবি নেয়। নিউজ রিডার মাথা সোজা করে ক্যামেরার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে চোখ রেখেই মনিটার দেখে খবরটি পড়তে থাকেন, দর্শক ভাবেন ওঁরা মুখস্থ বলছেন। এ-কর্মটি ঘোষণায়ও চলে, চলতে পারে স্টুডিওর ভেতর গৃহীত যে কোনও প্রডাক্শনেই, তবে এর একটা সীমাবদ্ধতা আছে। নাটক বা ফিল্মে এ টেকনিক চলে না।

একজন সৃজনশীল লেখকের যেমন ভাষা, শব্দ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়োজনীয় জ্ঞান ও সচেতনা থাকার প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন চিন্তা, যুক্তি, কল্পনা, আবেগ অনুভূতিকে যথাযথ আঙ্গিকে বেঁধে প্রকাশের ক্ষমতা— একজন টিভি লেখকেরও ঠিক ওইসব গুণগুলো থাকা আবশ্যক। কিন্তু এ-ছাড়াও তাঁকে আরো অতিরিক্ত কিছু জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে, যা অপরাপর লেখকদের জন্য আবশ্যক নয়। অর্থাৎ, লিখন-পদ্ধতি ছাড়াও তাঁকে শিখতে হয় ক্যামেরার ভাষা, রঙের ভাষা ধ্বনি ও শব্দের অন্তর্নিহিত অন্য-একটি ভাষা, আলো-আঁধারের মধ্যে প্রকাশিত নৈঃশব্দ্যের ভাষা।

লিখন-শিল্পে যেমন মনের ভাবনা ফুটে ওঠে কাগজের পাতায়, টিভি-তে (সামগ্রিক

অর্থে চলচ্চিত্রে) তেমনি কাগজের পাতার অক্ষরগুলো সেলুলয়েডের ফিতার উপর মূর্ত হয়ে ওঠে; এর অবলম্বন হ'ল ক্যামেরা, সাহিত্যে যেমন কাগজ-কলম। স্ক্রিপ্ট এখানে লক্ষ্য নয় উপলক্ষ, লক্ষ্য হ'ল ফিল্ম। স্ক্রিপ্ট-এর ভূমিকা হ'ল ক্যামেরাকে সহায়তা করা।

টিভি-স্ক্রিপ্ট প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আসার আগে যাওয়া যাক্ ক্যামেরার ভাষা প্রসঙ্গে।

ক্যামেরার ভাষা

একজন টিভি-লেখকের কাজের উপাদান শুধু কাগজ কলম নয়; তাঁর ভাবনা, চিন্তা কল্পনা প্রকাশে ক্যামেরা, রেকর্ডার, আলো এবং 'সেট'-এর ভূমিকা রয়েছে; অর্থাৎ তাঁর উপাদানগুলোর মধ্যেই রয়েছে এর নিজস্ব ভাষা, যার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে ক্যামেরার মাধ্যমে। এতএব, নিষ্প্রাণ এ যন্ত্রটির নিজস্ব ভাষাটি লেখকের রপ্ত করা চাই।

ক্যামেরার নিজস্ব ভাষাটি কী, এ এক বিশাল আলোচনার বিষয়, বর্তমান প্রসঙ্গে এত কিছুর প্রয়োজন নেই, আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় দিকে আলোকপাত করব। লিখিত সাহিত্যে যেমন রয়েছে অলঙ্কার, ছন্দ, উপমা, শব্দের কারিগরি, রূপান্তর, সৃজন, যেমন রয়েছে কমা, দাঁড়ি ইত্যাদি সংকেত তেমনি চলচ্চিত্রেরও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শট, রয়েছে মন্তাজ, কাট, ডিজল্‌ভ; রয়েছে প্যানিং, ফেড ইন্, ফেড আউট। এবং এ-সবই হ'ল ক্যামেরার ভাষা-সৃজনের অন্যতম উপাদান।

ক্যামেরার শট-গুলোর মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য : লঙ শট, ক্লোজ শট, টপ-শট, হাই-এঙ্গল এবং লো-এঙ্গল শট। এ শটগুলোর মাধ্যমে ছবিতে অনেক কথা, ভাব এবং ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা যায়। যেমন —

১. লঙ শট : জনপূর্ণ রাজপথে একটি মিছিল।
২. মিড-শট : মিছিলের জনতাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মানুষ একটু বেশি করে ক্যামেরার ফোকাসে এল।
৩. ক্লোজ-শট : ক্যামেরা ওই 'কিছু সংখ্যক মানুষের' মধ্য থেকে একজনকে আলাদাভাবে ফোকাস্ করল।

এ-শটগুলোর মধ্যে একটি বক্তব্য তৈরি হয়ে গেল কোনও কথা-র সাহায্য না নিয়েই; বক্তব্য ক্রমে General থেকে Particular হয়ে গেল। এর পর বিভিন্ন এঙ্গল থেকে ওই ক্লোজ-আপে ধরা একক ব্যক্তিটির চোখের, মুখের, কপালের, ঠোঁটের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে তাঁর মনোভাব অর্থাৎ ক্রোধ, প্রতিবাদ, হতাশা বা বিপন্নতাকে মূর্ত করে ক্যামেরাটি প্রকৃতই 'কথা বলা'র কাজটি করে নিল।

এ-ছাড়াও ক্যামেরা জুম করতে পারে, ফ্রিজড হতে পারে, হতে পারে স্বাভাবিক থেকে অনেক বেশি গতিশীল:

- মুষ্টিবদ্ধ একটি হাত হঠাৎ পর্দা জুড়ে ভেসে উঠলেই দর্শক এর ভাষা খুঁজে পাবেন।

- প্রাণভয়ে ছুটে চলা মানুষ হঠাৎ ফ্রিজড হয়ে গেলে তাঁর বিপন্নতাটি ধরা পড়বে সহজেই।
- দৌড়ে যাওয়া মানুষের স্রোতটির গতি দ্বিগুণ, চারগুণ এবং ষোল গুণ করে দিলে বোঝা যাবে 'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার'। (মৃণাল সেনের 'কোরাসের' শেষ দৃশ্যটির কথা স্মর্তব্য।)

টিভির-স্ক্রিপ্ট লেখককে এ-সব খুঁটিনাটি বিষয় বুঝে নিতে হবে, নইলে কোথায় কথা বলতে হবে, কোথায় রাখতে হবে নীরবতা এটা নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। বর্তমান প্রসঙ্গে এর বেশি কথা বলার অবকাশ নেই, কারণ আমাদের প্রতিপাদ্য হ'ল 'লেখনী'র কর্ম, ক্যামেরার শট টেকিং নয়।

এ আলোতে এ আঁধারে :

টিভি-ফিল্মে ক্যামেরাকে সব চেয়ে বেশি যে উপাদানটি সহায়তা করে তা-হ'ল আলো (এবং আঁধারও)। আলোর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আসছে রঙের প্রসঙ্গ। আলো-আঁধারের খেলা ছবির মুড সৃষ্টিতে, যথাযথ টোন স্থাপন করতে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আলোর কন্ট্রাস্ট, রঙের কন্ট্রাস্ট প্রতিনিয়তই ছবিতে নতুন নতুন মাত্রা দেয়। সামগ্রিক ভাবে এ-বিষয়টির দিকে স্ক্রিপ্ট-লেখক চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেন না।

শব্দ ও ধ্বনি :

টিভি-তে যেহেতু ছবির সঙ্গে পাশাপাশি আড়াআড়ি ভাবে শব্দ ও ধ্বনির বিচরণ, সেহেতু এখানে শব্দের ভূমিকা রেডিওতে এর ভূমিকার চাইতে ভিন্ন। টিভিতে ক্যামেরার সঙ্গে আলোর মিশ্রণের মধ্যিখানে রয়েছে শব্দ, ধ্বনি ও সংগীতের মিশ্রণ এবং এ সমস্ত উপাদানকে একসূত্রে গেঁথেই ছবিটি তৈরি করতে হয়। তাই একজন টিভি-লেখককে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় আনায়াস বিচরণশীল হতে হবে; তাঁর স্ক্রিপ্ট একদিকে যেমন বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর, অপরদিকে তেমনি শৈল্পিক রসে পরিপূর্ণও থাকতে হবে। কারণ, একটি ছবির মূল ভিত্তিভূমি হ'ল এর স্ক্রিপ্ট।

টিভি-স্ক্রিপ্ট রচনার তিনটি স্তর :

টিভি-স্ক্রিপ্ট রচনায় তিনটি স্তর রয়েছে : কনসেপশন, প্ল্যানিং এবং এক্সিকিউশন। এরকমই তিনটি স্তরের কথা লিখেছেন সিনেমার চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে ধীমান দাশগুপ্ত (চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ, কলকাতা ১৯৮৩, পৃ. ৫১)। তাঁর মতে তিনটি স্তর হল :

প্রথম, **সিনপ্‌সিস** : বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সারাংশ;

দ্বিতীয়, **ট্রিটম্যান্ট** : প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখে বিবৃতি; এবং

তৃতীয়, শুটিং স্ক্রিপ্ট : ছবি তোলা সম্পর্কে নির্দেশ।

এ পদ্ধতি সিনেমা অর্থাৎ বড় পর্দার সিনেমা এবং টিভির ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রযোজ্য। কিন্তু সিনেমার সঙ্গে ফিল্মের গুণগত, ভাবগত এবং কৌশলগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। বড় পর্দার চিত্রনাট্যের কলাকৌশল টিভির অনেক প্রয়োজনে লাগলেও, সব সময় তা খুব কার্যকরী হয় না।

কারণ —

- বড় পর্দার মধ্যে বিশাল থিম স্থান করে নিতে পারে, কিন্তু ছোট পরিসরে অর্থাৎ টিভির পর্দায় তা সম্ভব নয়।
- বিশাল মাপের ফরম্যাটে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়, একাধিক এপিসোড — পার্শ্বকাহিনী, উপকাহিনী, বহু সংখ্যক চরিত্র, ঘটনার সমাবেশ সম্ভব, কিন্তু টিভিতে এ সুযোগ নেই, অথবা সীমিত।
- সিনেমার থিম যদি হয় বহুমাত্রিক, টিভি-ফিল্মের থিম হবে একমাত্রিক। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের একটি বিশেষ দিক, বিশেষ ভাবনা — তা-ই টিভি-ফিল্মের প্রধান উপজীব্য। ব্যাপারটি অনেকটা প্রিন্ট মিডিয়ার 'ছোটগল্পে'র মতো'ই। এবং এ জন্য টিভি-ফিল্মের কৌশলগত পদ্ধতিও ভিন্ন। মিড-শট, লঙ-শট-এর স্থলে ক্লোজ শটের প্রয়োগ'ই টিভিতে অধিক। স্থান-কালের দ্রুত পরিবর্তনের সুযোগও টিভিতে সীমিত। তবে ক্যামেরার বিচিত্রগামিতার সঙ্কোচন টিভিতে যদিও একেবারে অত্যাবশ্যক নয়, তবু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব, অনুভূতি, ছোট দুঃখ, ছোট সুখ, স্বপ্ন, কিম্বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের চিত্রায়ণে close-shot ফিল্মটিকে সার্থক করে তোলে।
- আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এমন ঘটনা অহরহ'ই ঘটে চলে যা বড় মাপের ফ্রেমে চলচ্চিত্রায়িত হবার দাবি করতে পারে না, কিন্তু টিভির ছোট পর্দায় এসব ঘটনা আশ্চর্য দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে। ছোট ছোট কথা, অনুভূতি, দুঃখ, গ্লানি বেদনার পীড়ন, কিম্বা আশা আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসা নিয়ে মহাকাব্য লেখা যায় না; লেখা যায় না বিস্তৃত পরিসরের উপন্যাসও; কিন্তু এরকম ছোট্ট, নিতান্তই ছোট্ট বিষয়বস্তু — পথপাশে অবহেলায় ফুটে থাকা ফুল, আধো রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার অনুভূতি, কিম্বা ডাইনে বায়ে পড়ো জমি, খড় নাড়া, মাঠের ফাটল, শিশিরের জল, দোলমঞ্চের পাশে ধান খুঁটে খাওয়া চারটি চড়ুই, লাঠির ডগায় পুঁটলি বাঁধা লোকটির দুর থেকে দূরে চলে যাওয়া — এসব দৃশ্য, ভাব, চিত্রকল্প অসাধারণ সব টিভি-ফিল্মের সম্ভাবনায় ভরপুর। সিনেমার বড় পর্দায় কি এসব মানায়?
- নিঃসঙ্গ চিত্রশিল্পী, শব্দ সন্ধানী ভাষাবিজ্ঞানী, রাস্তার পাশে দোতারা-বাজানো ভিখারি, অশীতিপর স্বাধীনতা সংগ্রামী — এদের নিয়ে

স্ক্রিপ্ট হাতে সত্যজিৎ রায়

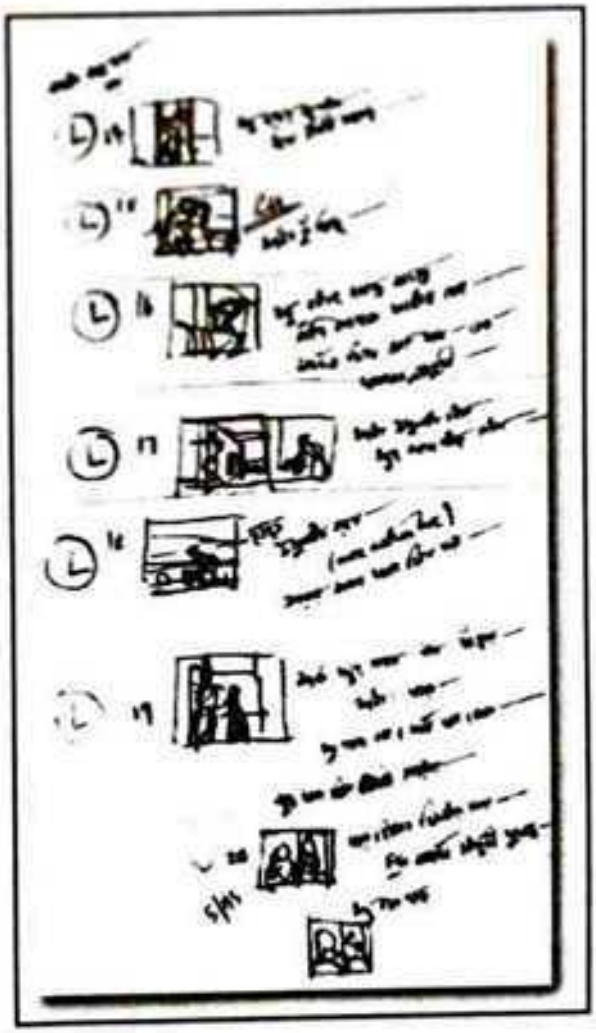

সত্যজিৎ রায়ের স্ক্রিপ্ট

পূর্ণাঙ্গ বড় পর্দার সিনেমা তৈরি করা সহজসাধ্য কাজ নয়, কিন্তু অসাধারণ টিভি-ফিল্ম নির্মাণ সম্ভব; এবং এ-রকম ফিল্ম করেছেন সত্যজিৎ রায়। প্রাক্-টিভি যুগে, 'Inner Eye' [(বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়), 'রবীন্দ্রনাথ' বিশেষ উল্লেখ্য], মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক; টিভি-র পর্দায় পূর্ণেন্দু পত্রী, গৌতম ঘোষ, শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নিহালনীরা এরকম কাজ করেছেন; আর প্রতিদিনই আঞ্চলিক, প্রাদেশিক স্তর থেকে জাতীয় স্তরে এরকম ফিল্ম তৈরি হচ্ছে, যার অনেকগুলোই শৈল্পিক দিকে সফল। বিষয়ভিত্তিক, তথ্যভিত্তিক, বিনোদনমূলক, শিক্ষামূলক কিম্বা প্রচারধর্মী ছোট্ট ফিল্মগুলোর এখন একমাত্র অবলম্বনই হ'ল টিভির ছোট পর্দা। টিভি-বিপ্লবের আগে সিনেমা হলে দর্শকদের কাছে নির্ধারিত ছবির সঙ্গে একটা বাড়তি আকর্ষণ ছিল সরকারি উদ্যোগে (কেন্দ্রীয় ফিল্ম ডিভিশন প্রয়োজিত) দশ পনেরো মিনিটের ডকুমেন্টারি ছবি। এখনও এ ছবিগুলি তৈরি হয়, প্রদর্শনও হয় মাঝে মধ্যে কিম্বা সবসময়ই; কিন্তু এ ডকুমেন্টারি ফিল্মগুলো এখন আর সিনেমার লেজুড় হয়ে না থেকে স্বমহিমায় উঠে এসেছে টিভির পর্দায়। টেলিফিল্ম, টেলি ড্রামার স্থান এ মুহূর্তে টিভি-তে নিতান্তই সঙ্কুচিত। এদের স্থলে রয়েছে অগুনতি 'সিরিয়েল'। আর, এই সিরিয়েল, নিউজ আইটেম, বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান বাদ দিলে টিভি সম্প্রচারণের একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে ডকুমেন্টারি — সরকার নিয়ন্ত্রিত ডিডি-চ্যানেল এবং প্রাইভেট কমার্শিয়েল চ্যানেলগুলোতেও।

আমরা পরবর্তী অংশে টিভি-ডকুমেন্টারির স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানব।

টিভি-ডকুমেন্টারি

ফিল্ম-ডকুমেন্টারির পুরোধা ব্যক্তিত্ব জন গ্রিয়ার্সন-এর মতে ডকুমেন্টারি-ফিল্ম হ'ল 'a creative treatment of actuality'। এ ধরনের ছবিকে একসময় 'factual film'ও বলা হতো। গ্রিয়ার্সনের Night Mail একটি দিক নির্দেশকারী ডকুমেন্টারি-ছবি। রবার্ট ফ্লাহার্টি'র Nanook of the North প্রথম পর্যায়ের ডকুমেন্টারি ছবির মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছবি।

ইউরোপের চলচ্চিত্রকাররা ডকুমেন্টারি ফিল্মকে 'বাস্তব জগতের বাস্তব মানুষের' চিত্রও বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা বাস্তব ঘটনার নাটকীয় উপস্থাপনা (dramatic representation of facts)। এ নাটকীয়তা অবশ্য বাস্তবকে ঝাপসা করে দেবার জন্য নয়, বাস্তবকে আরো প্রত্যক্ষ, তির্যক এবং মর্মস্পর্শী করার জন্যই। সার্থক ডকুমেন্টারি বা তথ্যচিত্র কেবলমাত্র কোনও কিছুর উপস্থাপনাই নয়, বিশ্লেষণও। এবং

বাস্তবের বহুমাত্রিকতার অনুসন্ধানও।

ডকুমেন্টারি-ছবি আসলে একটি সৃজনশীল কর্ম, যেখানে মিশে যায় তথ্য এবং তত্ত্ব, চিন্তা এবং কল্পনা, নির্মাণ এবং সৃষ্টি।

সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' কি নিছকই একটি বায়ো-ফিল্ম (bio-film), না শতবর্ষের আলোকে কবিগুরুর পুনরাবিষ্কার? তাঁর The Inner Eye 'আলোর জগতে অন্ধকারের প্রতিনিধি' (!!) বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুনর্নির্মাণ, মানবজীবনের গভীরতর এক ভাষ্যই যেন।

পশ্চিমে এ-শতকের কুড়ির দশকে সূচনা হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী দিনগুলোতেই ডকুমেন্টারি-ছবি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র ধারণ করতে থাকে। আর ইউরোপে টিভি আসার সঙ্গে সঙ্গেই এ ছবি গুরুত্ব লাভ করে স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবেই। ভারতবর্ষে টিভি সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৫৯ সালে। কিন্তু টিভির পর্দায় ডকুমেন্টারি ছবি আত্মপ্রকাশ করে আশির দশক থেকে, যদিও এ ছবি-তৈরি শুরু হতে থাকে এর অব্যবহিত পূর্ব থেকেই।

দূরদর্শনের প্রযোজনায় প্রথম টিভি-ডকুমেন্টারির মধ্যে সাধন মল্লিকের Highway No.1, সাঁই পরাঞ্জপে-র A Little Tea Shop, রবিশঙ্করের উপর শুক্লা দাসের Alap, মাদার টেরিজার উপর Gift of Love, রাজন-এর Under the Banyan Tree, সুধীর মাথুরের A Child Hawker, গোপাল সক্সেনার Rivelry in the Sky, Sau Saal Paar — ছবিগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিব শর্মার বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনার ভূমিকা নিয়ে ডকুমেন্টারি ছবিটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দূরদর্শনে 'জাতীয় কার্যক্রম' আরম্ভ হয় ১৯৮২-র ১৫ আগস্ট। টিভি-ডকুমেন্টারির জগতে এটা একটা অধ্যায়েই সূচনা। এর পরবর্তী দিনগুলোতেই আমরা পাই দূরদর্শনের নিজস্ব প্রযোজনা, পেশাদার চিত্রনির্মাতাদের দিয়ে তৈরি এবং কর্মাশিয়্যাল, স্পন্সর্ড ডকুমেন্টারি ছবি। আমরা পেলাম হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের The Trees, বাসু ভট্টাচার্যের Known Yet Unknown, মুজাফ্ফর আলির Kajri, কে.এ. আব্বাসের Naked Phakir প্রভৃতি ছবি।

স্পন্সর্ড ডকুমেন্টারির মধ্যে পেলাম Kasauti Pradakshina, এবং বাংলা নাট্যজগতের উপর শ্রীমতী শোভা সেনের সিরিয়ল In Search of Theatre। এ প্রসঙ্গে ডকু-ড্রামা 'স্ত্রী'র উল্লেখও করতে হয়, অনেকগুলো পর্বে এতে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নারী-ব্যক্তিত্বদের পেশাদার অভিনেত্রীর সাহায্যে নাটক-ফর্মে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নব্বুই-এর দশকে দূরদর্শনের কর্মকাণ্ডে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে — অনুষ্ঠানগুলোর বাণিজ্যিকীরণ ঘটে, সম্প্রচারণ সময়ের প্রতিটি সেকেন্ডই আগাম বিক্রী হয়ে যায় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর কাছে — এবং এ সংস্থাগুলোর স্পন্সর্ড সিরিয়েল একে

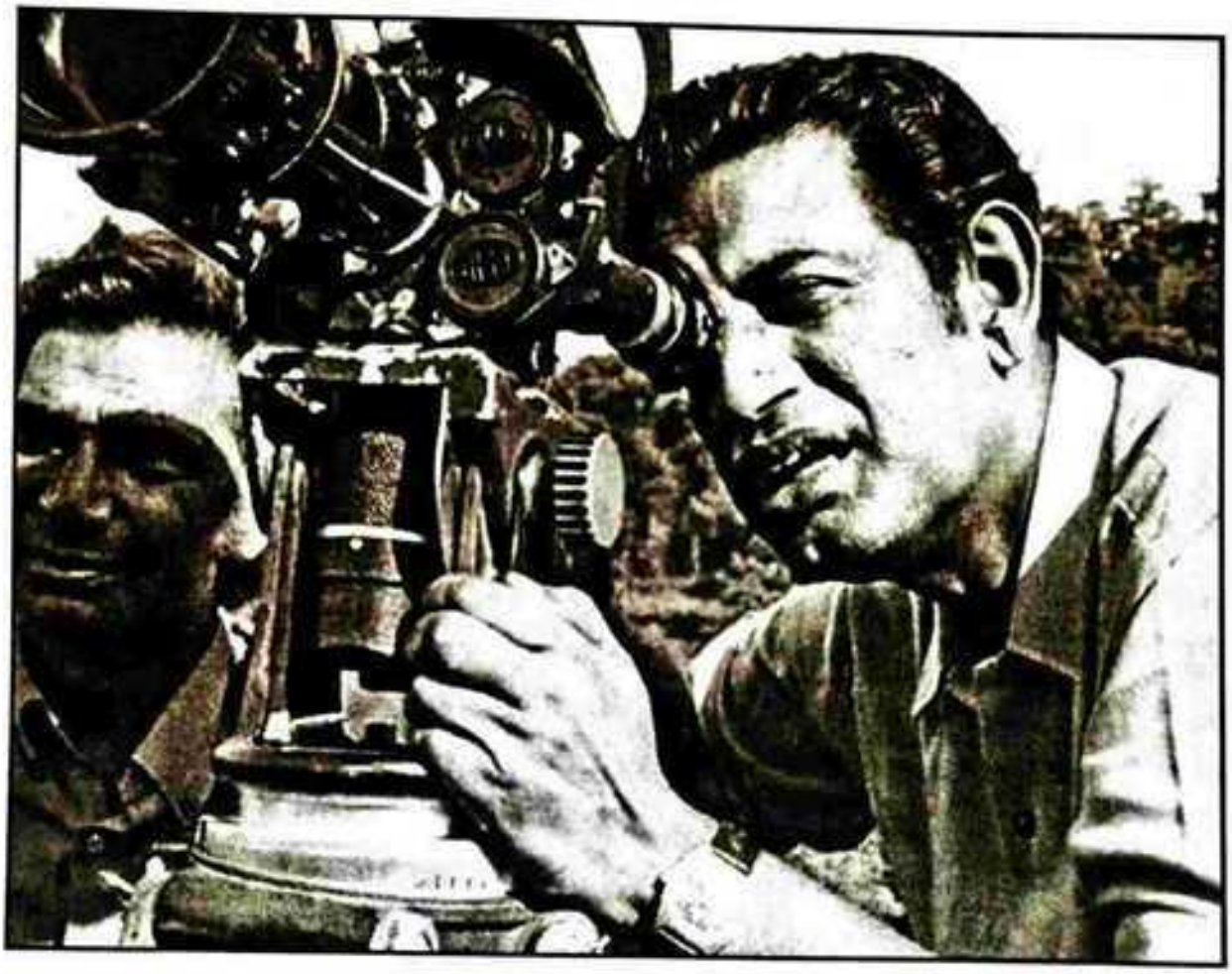

তাঁর প্রকাশ মাধ্যম শুধু ক্যামেরার ল্যান্স নয় কলমও

একে একে দূরদর্শনের সব ক'টি চ্যানেলই গ্রাস করে ফেলে। সমান্তরালভাবে প্রাইভেট চ্যানেলগুলো এসে গেলে এতে প্রধান হয়ে ওঠে বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, যৌনতা, সংকোচবিহীন বিহ্বলতা, মধ্যবয়সী ন্যাকামো, উচ্চবিত্তের ফ্যাশন, আমদানীকৃত হতাশা, কোটিপতিদের ব্যবসা বাণিজ্য জগতের সংকট, দেবতা, ভূতপ্রেত, নরপিশাচ, বিজ্ঞানভিত্তিক কুসংস্কার, আরো কত কি।

একদিকে টিভি-দর্শকের রুচির পরিবর্তন হয়, অপরদিকে সিরিয়াস বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু করে নেওয়াও এদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ডকুমেন্টারি ছবি স্থান পায় সরকারি চ্যানেল ডিডি-১-এ, এবং এখান থেকে আশ্রয় খুঁজে UGC অনুষ্ঠানের স্লটে। কিংবা একটু রূপ বদ্‌লে মিশে যেতে চায় বিনোদনমূলক স্পন্‌সর্ড টিভি-ম্যাগাজিনের মধ্যেই। ডিডি-১ চ্যানেলের 'সুরভী' অনুষ্ঠানটি আসলে কয়েকটি ডকুমেন্টারির সংমিশ্রণই।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বলেছিলাম যে বড় পর্দার সিনেমার লেজুড় হয়ে না-থেকে ডকুমেন্টারি-ছবি ক্রমে টিভির পর্দায় নিজস্ব স্থান খুঁজে নিচ্ছে। কিন্তু অতি-সাম্প্রতিক লক্ষণটি আবার টিভির পর্দায় ডকুমেন্টারি ছবির পক্ষে খুব একটা আশাব্যঞ্জক — তাও বলা যাচ্ছে না। অর্থাৎ ডকুমেন্টারি ছবির সামনে একটা সংকট দেখা দিচ্ছে, আগামী দিনে এর ফলে এ-ছবি নিশ্চয়ই নতুন পথে চলবে।

এ পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে একটি ধারণা মনে রেখে এবার আমরা আসতে পারি টিভি-ডকুমেন্টারি স্ক্রিপ্ট-রচনাতে।

এখানে লেখককে বিষয়বস্তু অন্বেষণ, গবেষণা, উপস্থাপনা এবং শুটিং স্ক্রিপ্ট রচনা— এ প্রতিটি স্তরের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হতে হবে। আমরা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি স্তর নিয়েই আলোচনা করব :

(ক) বিষয়বস্তু

লেখককে প্রথমে তাঁর থিম (theme) টি কী, তা স্থির ক'রে নিতে হবে। বাস্তব কোনও বিষয় কিংবা কোনও 'আইডিয়া' ডকুমেন্টারির থিম হতে পারে; সংস্কৃতি-সাহিত্য বা কোনও শিল্প ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন; কোনও ঐতিহাসিক স্থান, কোনও পর্যটনকেন্দ্র, কোনও সামাজিক ঘটনা, প্রতিবাদ — এ'সব কিছুই টিভি-ডকুমেন্টারির বিষয়বস্তু হতে পারে। ছবিটির স্টাইল, আঙ্গিক এবং পরিসরও ছবির বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। বিষয় অনুযায়ী কোনটি হবে লিরিক্যাল, কোনটি হতে পারে রিপোর্টাজ ধর্মী, কোনটি বা হতে পারে বক্তব্য প্রধান। বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে গেলে আসবে পরবর্তী স্তর —।

(খ) গবেষণা

যে-কোন সৃজনশীল কর্মের পেছনে গবেষণার একটি ভূমিকা থাকে। প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রহ স্ক্রিপ্ট-লেখককে নিষ্ঠাবান গবেষকের মতই করতে হবে। লাইব্রেরি-ওয়ার্ক

এবং ফিল্ড ওয়ার্ক দুটোই তাঁকে করতে হবে। তাঁর গবেষণাটি দ্বিবিধ : একদিকে তথ্য-সন্ধান, অপরদিকে তথ্য সমূহের মধ্যে ভিসুয়েল-সম্ভাবনার অনুসন্ধান। তাঁর চিন্তাটি মস্তিষ্কজাত হয়েও চক্ষুষ্মাণ হওয়া চাই। তাঁকে সে-সব তথ্যের দিকেই মনযোগী হতে হবে যে তথ্যের মধ্যে ভিসুয়েল-সম্ভাবনা রয়েছে।

লিখিত-তথ্য (বর্ণনার জন্য) এবং ফোটোগ্রাফিক-তথ্য (প্রোজেক্শনের জন্য) — দুটোই তাঁর অনুসন্ধান কর্মের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ গবেষণা-কর্মে লেখক নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সাহায্যও নিতে পারেন।

[পশ্চিমে গবেষণা-কর্মটি আজকাল একটি ব্যবসাও। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক সংস্থা এক-একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন, প্রফেশন্যাল-রিসার্চার রাখেন, এদের পরম নিষ্ঠাভরে গবেষণা চালিয়ে যেতে সহায়তা করেন এবং তাঁদের গবেষণার ফল বাজারজাত করেন। চলচ্চিত্র-নির্মাতা, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ কিংবা শিল্পীরা নিজ প্রয়োজনে এসব গবেষণালব্ধ তথ্য নগদ অর্থে কিনে নেন। আমাদের দেশে অবশ্য এখনও গবেষকরা এক ধরনের বেগার শ্রমিকই। সম্মান ও প্রশংসাতেই এদের তৃপ্ত থাকতে হয়।

গণমাধ্যমের ব্যাপক সম্প্রসারণের যুগে, বিশেষ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে তথ্য-ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায় এখন। আঞ্চলিক স্তরে, একান্ত স্থানীয় বিষয়বস্তুর সংগ্রহ নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তথ্য-কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব এবং এর গুরুত্ব হবে অপরিসীম। কারণ একেবারে স্থানীয় তথ্যের জন্য রাজ্য স্তরে তথ্য-কেন্দ্র, ড্যাটা-ব্যাঙ্ক, আর্কাইভ, লাইব্রেরি কিংবা হালের 'ইন্টারনেট' খুব একটা কাজে লাগবে বলে মনে হয় না— অথচ এ-সব তথ্য ছাড়া ডকুমেন্টারি-ছবি তো হতেই পারে না।]

(গ) বিষয়-উপস্থাপনা

মূল স্ক্রিপ্টে যাবার আগে লেখককে একটি সংক্ষিপ্তসার লিখে নিতে হবে। ছবিটির স্টোরিলাইন, ছবির উদ্দেশ্য, এর প্রাসঙ্গিকতা, এর অন্তর্নিহিত কোন বার্তা, শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য— সব কিছুই সুস্পষ্টভাবে লিখে নিতে হবে। স্ক্রিপ্ট লিখতে বসার এই প্রাক্-প্রস্তুতিটি সঠিকভাবে নিয়ে নিলে লেখককে আর অন্ধকারে হাতড়াতে হবে না।

(ঘ) আঙ্গিক পরিকল্পনা

এতে আছে ভিসুয়েল এবং অডিও অংশের জন্য পৃথক পরিকল্পনা। ভিসুয়েল অংশে রয়েছে লোকেশন, শট-ডিভিশন, স্পট-ইন্টারভিউ এবং ভিসুয়েল-ইনসার্ট (গ্রাফিক্স, স্থির চিত্র, ফাইল চিত্র) ইত্যাদি। অডিও অংশে রয়েছে দুটো ভাগ : একটি হ'ল কথন (অর্থাৎ ওর‍্যাল), আরেকটি হ'ল শব্দধ্বনি ও সংগীত (মিউজিক এন্ড সাউন্ড এফেক্ট)।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা রেডিও-মাধ্যমের স্ক্রিপ্ট-প্রসঙ্গে যা কিছু উল্লেখ করেছি এর অনেক কিছুই টিভি-স্ক্রিপ্ট-লিখনের প্রাথমিক কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যেতে

পারে— তবে এ-কথাটি সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে টিভির কথন এবং শব্দ-ধ্বনি-সংগীত রেডিওর চাইতে যথেষ্ট ভিন্ন।

টিভি-ডকুমেন্টারির লেখকের মনে রাখতে হবে যে দর্শকের সামনে এখন হাজারটা পর্দা খোলা— ওঁরা যে-কোন মুহূর্তেই রিমোটকন্ট্রোলে আঙুল চালিয়ে যে-কোন জগতে চলে যেতে পারেন। তাই দর্শকের আগ্রহটি ধরে রাখতেই হবে— এবং এজন্য যথেষ্ট চিন্তা, শ্রম ও মেধা এবং কল্পনার প্রয়োজন।

ডকুমেন্টারি ছবি আসলে যেন প্রিন্ট-মাধ্যমের প্রবন্ধ বা নিবন্ধই— বড় বেশি তথ্যপূর্ণ, কথা সর্বস্ব এবং বক্তব্য প্রধান। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন যে, তিনি প্রাণ সঞ্চারের জন্য তাঁর গদ্যে কিছুটা কবিতা মিলিয়ে দিয়েছেন (প্রবন্ধ সংকলন, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ: ২১)। ঠিক তেমনিই ডকুমেন্টারির কঠিন বাস্তবকে একটু কাব্যিক ছোঁওয়া দিয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে। (অতি অবশ্যই খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে, বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিতে– আবেগাক্রান্ত হয়ে নয়।) ডকুমেন্টারিতে কঠিন বাস্তবের মধ্যে যেমন কবিতার ছোপ দেওয়া যায়, তেমনি আবার কাল্পনিক বিষয়ে, অর্থাৎ যেখানে আবেগ, কল্পনা কিংবা সূক্ষ্মতর চেতনার অভিব্যক্তি রয়েছে– এ রকম থিমটিকে গদ্যের কাঠামোয় বেঁধে নেওয়া যায়। অর্থাৎ যেখানে excess of emotional fervour অপরিহার্য, সেখানে আবেগকে সংহত করে নেওয়া, 'an escape from emotion'-এর প্রচেষ্টায় রত হওয়া আর কি। এতে স্ক্রিপ্ট প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠবে সংযত, বাহুল্যবর্জিত, অর্থাৎ একেবারে আধুনিক।

ডকুমেন্টারির লেখককে একই সঙ্গে ক্রিয়েটিভ এবং ক্রিটিক্যাল হতে হবে। তাঁর কর্মে মস্তিষ্কচর্চার যতটুকু স্থান থাকবে, ঠিক ততটুকু স্থানই যেন থাকে কল্পনা বা ভাবাবেগের। ডকুমেন্টারি ছবির মত আধুনিক মাধ্যমটির লেখককে কঠিন বাস্তবের গভীরে আরেকটি বাস্তবের সন্ধান করতে হবে। আবার একই সঙ্গে কল্পসৃষ্ট অলীক জগতকে এনে সংস্থাপন করতে হবে একেবারে বাস্তবের চেহারায়। এ মানসিকতার কাছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি-কবিতা আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিশ্লেষণ হিসেবে প্রতিভাত হবে, রবীন্দ্রনাথের 'আকাশ ভরা সূর্যতারা'র বন্দনা হয়ে উঠবে পরিবেশ-আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো, 'গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা, হিজলের ক্লান্ত পাতা'র কথকতা হয়ে উঠবে মানব জীবনের করুণ ভাষ্য।

(ঙ) শুটিং স্ক্রিপ্ট

যদিও ডকুমেন্টারির নির্মাণ কৌশল কথাচিত্রের নির্মাণ কৌশল থেকে ভিন্ন, অর্থাৎ কথাচিত্রে লিখিত স্ক্রিপ্ট একেবারে অপরিহার্য, ডকুমেন্টারিতে যা সব সময় ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়– তবুও পূর্ব-নির্ধারিত শুটিং-স্ক্রিপ্ট একান্তই আবশ্যক। একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো সামনে থাকলে পরে তখনই এর সীমারেখাকে অতিক্রম করলে সেটা আয়ত্তের বাইরে যায় না। কিন্তু কোন পূর্ব-নির্ধারিত সীমারেখা যেখানে নেই, সেখানে সমস্ত কর্মটিই

থাকে কেমন যেন অনিশ্চয়তায় ভরা। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অসাধারণ প্রতিভাশালী বোহেমিয়ান পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে। তিনি অনেক সময় কোন স্ক্রিপ্ট সামনে না রেখেই শুটিং-এ নামতেন– এবং অতি অবশ্যই এ কর্মপদ্ধতির অসামান্য সাফল্যও তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু এই একই পদ্ধতিই যে তাঁর কাজের গতি-কে ব্যাহত করেছে– অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেল্‌স ছবিতে উপেক্ষিত হয়েছে– ছবিতে তাঁর প্রতিভার যথাযোগ্য প্রতিফলন অনেক সময়ই ঘটেনি— এটাও আমরা লক্ষ করেছি। উল্লেখ্য, ঋত্বিক ঘটক সম্ভবতঃ ষাটের দশকের শেষ দিকে রামকিঙ্কর বেইজ-এর উপর একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণের কাজ শুরু করেন–। কাজটি অতি অবশ্যই শেষ হয়নি, কারণ উভয়ই ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন এবং প্রচণ্ড অগোছালো। অসমাপ্ত ছবিটি এখন কোথায় কী পর্যায়ে আছে, তা আমরা জানি না, তবে ছবিটি যে শিল্পীদ্বয়ের প্রতিভায় স্থানে স্থানে উজ্জ্বলতায় ভাস্বর, এ আমাদের বিশ্বাস।

একটি টিভি-ডকুমেন্টারির স্ক্রিপ্ট
'আবার আসিব ফিরে'
জন্ম শতবর্ষে রূপসী বাংলার
কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতি সশ্রদ্ধ নিবেদন

VIDEO	AUDIO
Caption- 1	
Caption- 2	
জন্ম শতবর্ষে রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতি সশ্রদ্ধ নিবেদন–	Title Song (Male voice)
আবার আসিব ফিরে	আবার আসিব ফিরে–
রচনা ও পরিচালনা:	
Caption - 3 প্রযোজনা:	Title Song fades out
PHASE- II	
• পর্দা জুড়ে জীবনানন্দের একটি স্থির চিত্র	• বাঁশিতে মেঠো সুর
• ফটো Fade out হতেই পর্দায় এল বাঙলার নদীনালা-কান্তার-আম-জাম-কাঁঠাল-হিজল অশ্বত্থ, জলাশয়ে সাদা বক্, মাছরাঙা, হাঁস-এবং ক্যামেরায় ধরা পড়ল নীল আকাশ	• O/V এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে সবচেয়ে সুন্দর করুণ/যেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে/ মধকূপী ঘাসে অবিরল;/ যেখানে/ গাছের নাম: কাঁঠাল,অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল।
• ভোরের লাল আকাশ	• যেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ
• পর্দা জুড়ে আসবে অবিভক্ত বাংলার মানচিত্র, এবং তা Fade out হ'তে হ'তে ভেসে উঠবে জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো, কাটাকুটি, স্কেচ সব কিছু নিয়ে (দেবেশ রায় সম্পাদিত রূপসী বাংলার পাণ্ডুলিপি, প্রতিক্ষণ প্রকাশনা, কলকাতা)	• Music (instrument) suggesting the folk-life of Bengal
	O/V
• Close-up এ চালতার পাতা, শিশির ঝরছে–	• আমি আসিবনা ব'লে চালতা ফুল কি ভিজিবেনা শিশিরের জলে . . .
চুপচাপ বসে আছে একটি প্যাঁচা	• লক্ষ্মীপেঁচা কি গাবে না গান তার লক্ষ্মীটির তরে–

VIDEO	AUDIO
• দূর গ্রামে আলোক শিখা,	• চারিদিকে শান্ত বাতি, ভিজে গন্ধ, মৃদু কলরব।
• নদীর পাড়ে নৌকা লেগেছে	• খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে —
• কালো হয়ে আসছে নদীর জল	• Sounds suggesting evening, প্যাঁচার ডাক, (hooting of the owl) সন্ধ্যার ঝিঁঝিঁপোকা, পাখপাখলির ঐক্যতান এবং রাখালিয়া বাঁশি O/V পৃথিবীর এইসব গল্প চিরকাল বেঁচে রবে, এশিরিয়া ধুলি আজ, বেবিলন ছাই হয়ে আছে
Table form: জীবনানন্দ দাস: জন্ম: ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৮৯৯ মৃত্যু: অক্টোবর ২২, ১৯৫৬ স্থান: বরিশাল	O/V আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে— জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দাশের এ পঙক্তি আজো বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয় — তাঁর নিঃসঙ্গ লাজুক, একাকিত্ব- সন্ধানী পুত্রের মুখের হাসি কী জানি কেন হারিয়ে গেল নিজেরই মুদ্রাদোষে —
• জীবনানন্দ-গবেষক - (১) caption - নাম, পদবী গবেষকের হাতে বইপত্র, তাঁর লেখা বই-এর প্রচ্ছদও পর্দায় একবার আসবে	• 'বাবা আমার পরম বন্ধু ছিলেন ... মজলিশী বা প্রগাঢ় মানুষ যখন আমাদের বাড়িতে আসতেন, সেসব উপচে পড়া সময়ে বাবার চলায়-বলায় খুশির ঝিলিক দেখেছি অন্তরঙ্গ আলোহাওয়ায় উচ্ছল সময়ে ঝরনার মতো শব্দ করে হাসতেন, কখনো মজার কথাও বলতেন'
• মঞ্জুশ্রী দাশের ছবি caption — নাম	• (গবেষক বলছেন) ঃ এ কথাগুলো যিনি বলছেন তিনি কবির কন্যা মঞ্জুশ্রী দাশ—।
• বুদ্ধদেব বসুর ছবি caption — নাম, বুদ্ধদেব বসুর বই এর প্রচ্ছদ।	• আসলে বুদ্ধদেব বসু'ই জীবনানন্দের মূল্যায়নে একটি কথা বলে কবি সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে

জীবনানন্দ দাশ

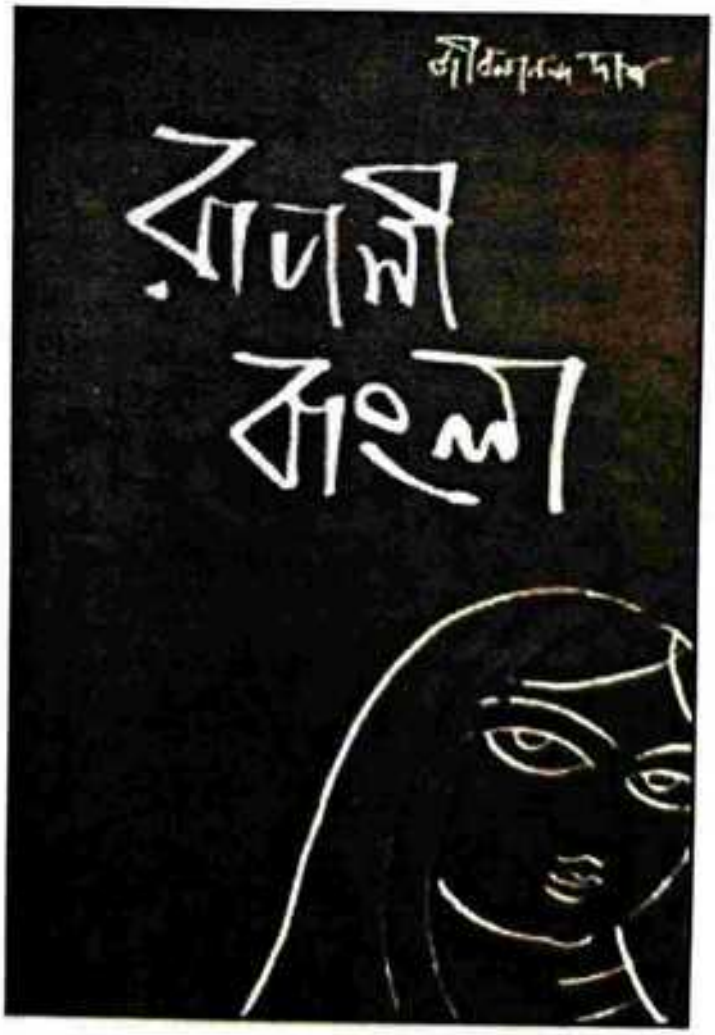

VIDEO	AUDIO
	দিয়েছেন — সে কুয়াশা সরাতে বুঝি আরো অনেক দিন লাগবে (গবেষক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন) তাঁর বক্তব্যে জীবনানন্দের কবিতার আঙ্গিক, ভাষা, শব্দ, চিত্র কল্প ইত্যাদি প্রসঙ্গ আসবে।
• কবির সমসাময়িক সাহিত্যিকদের চিত্র, পত্র পত্রিকার প্রচ্ছদ (পরিচয়, কবিতা, চতুরঙ্গ) এবং মুদ্রিত কবিতার অংশ পর্দায় আসবে	
• পর্দায় আসবে– ঝরা পালক ধূসর পাণ্ডুলিপি বনলতা সেন মহাপৃথিবী সাতটি তারার তিমির শ্রেষ্ঠ কবিতা উপন্যাস সমগ্র (প্রতিক্ষণ প্রকাশনা) - বইগুলোর প্রচ্ছদ	Narration continues
• পুরনো কলকাতার রাস্তাঘাট, ট্রাম, টানা রিক্সা, (প্রেসিডেন্সি কলেজ, সিটি কলেজ ১৯২২ সালে কবি এখানে অধ্যাপনা করতেন) দিল্লী (১৯৩০-৩১ সালের)	Narration ends
• স্টিরিওতে LP record ঘুরছে রেকর্ডটি বড় হয়ে একেবারে পর্দা জুড়ে দেখা দিল - আর এর পর Fade out হতেই পর্দায় এলেন শম্ভু মিত্র (স্থির চিত্র, কিংবা Live, file shot থেকে) caption — শম্ভু মিত্র, LP রেকর্ডের কভার (আধুনিক কবিতা আবৃত্তি, শম্ভু মিত্র; INRECO LP 2425-0002 Side - II CUT-3)	• শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি ঃ সিন্ধুসারস
• সমুদ্রের ঢেউ, সাদা ফেনা, সিন্ধুসারস আকাশে উড়ে যাওয়া পাখি	• রেকর্ডে আবৃত্তি– (নির্বাচিত অংশ) ... আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থাকি চেয়ে দেখি বরফের মতো সাদা ডানা দুটি আকাশের গায় / ধবল ফেনার মতো নেচে

VIDEO	AUDIO
	উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।
• দলে দলে ছুটে চলা সামুদ্রিক পাখি	... জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,/তুমি পিছে চাহোনাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর পাণ্ডুলিপি; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর ... চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি জন্ম নিয়েছিলে কবে/ বিষণ্ণ পৃথিবী ছেড়ে দলে দলে নেমেছিলে সবে / আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে — দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে।
• ৪৪ বৎসর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি caption — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	• Instrument এ ১৯০৫ সালের একটি প্রতিনিধি স্থানীয় রবীন্দ্রসংগীতের সুরের আভাস O/V Female Voice: ষোলো বছর বয়সে জীবনানন্দ তাঁর একটি কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন খোদ কবিগুরুর কাছেই। স্বীকৃতি মিলেছে, মিলেছে অনুযোগ —
caption — কবির স্বহস্তে স্বাক্ষর	Male Voice: 'তোমার কবিত্ব শক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু ভাষা নিয়ে এত জবদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে।'
• জনৈক আবৃত্তিকার— (২) caption — শিল্পীর নাম– • কবিতার চিত্রকল্পগুলোই picturisation হবে পর্দায় — এবং এর অবহিত পরেই আসবে • রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৪ বছর বয়সের ছবি	আবৃত্তি : (নির্বাচিত অংশ) আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায় / দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল / কুয়াশার; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায় / তাঁর সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল / জোনাকিতে ভরে গেছে; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে / চুপে

VIDEO	AUDIO
	দাঁড়ায়েছে চাঁদ — কোন সাধ নাই তার ফসলের তবে ...
	• Instrument এ ১৯৩৫ সালের প্রতিনিধি স্থানীয় একটি প্রকৃতি পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের আভাস —
	• O/V Male Voice (বয়স্ক কণ্ঠ) : 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে ... 'তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।'
• জীবনানন্দ গবেষক (৩) caption — নাম, পদবী • পর্দায় জীবনানন্দের বংশপঞ্জি ভেসে উঠবে 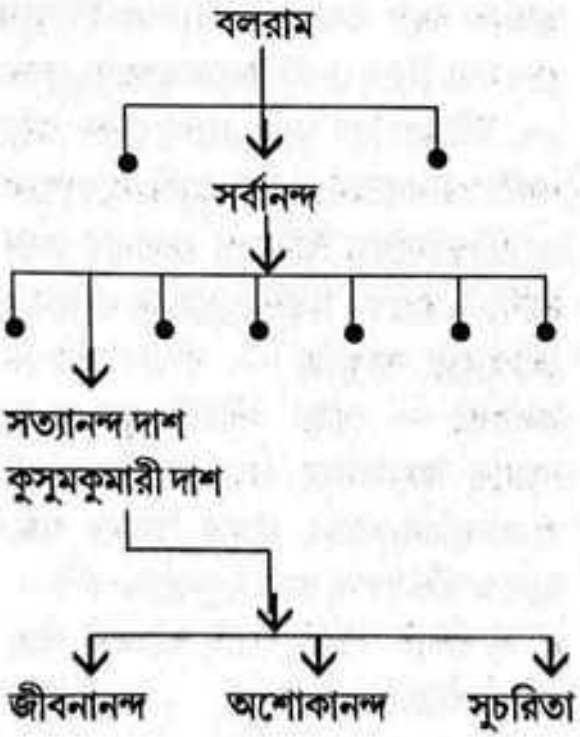 	গবেষক জীবনানন্দের গ্রাম, বরিশাল জেলা, পারিবারিক ঐতিহ্য এসব প্রসঙ্গ সাধারণ আলাপচারিতার মতো বলে যাবেন। বক্তা কথা প্রসঙ্গে জীবনানন্দের শৈশবের কথাও বলবেন — 'শৈশবে কবির ঘুম ভাঙতো বাবার কণ্ঠে উপনিষদের আবৃত্তি শুনে ...
	• O/V শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা সংস্কৃত উচ্চারণ Fade হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই Male Voice-এ আবৃত্তি : 'শুনেছি কিন্নর কণ্ঠ দেবাদারু গাছে, দেখেছি অমৃত সূর্য আছে —
• জীবনানন্দের ছবি — • গ্রামের দৃশ্য, পাখ পাখালি মাঠ, নদীর দৃশ্য	

VIDEO	AUDIO
• কবিতাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বনস্পতির আড়ালে রক্তিম সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখা যাবে।	
• বইখাতা হাতে দুজন বসেছেন - (৪) caption-1 নাম : ইতিহাসবিদ caption-2 নাম : লোকসংস্কৃতি গবেষক	লোক সংস্কৃতি গবেষক বলছেন :
	• 'আপনি লক্ষ করেছেন জীবনানন্দের রূপসী বাংলার জগতে সীতারাম - রাজারাম - রামনাথ রায়-বল্লাল সেন-রাজবল্লভ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত বিচরণ করছেন। এখানে রয়েছে গৌড়বাংলা, পিরামিড যুগ, এশিরিয়া-বেবিলন - রোম - উজ্জয়িনী - বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ — অন্ধকারে আধো আলোতে বিদর্ভ নগরে কবির পথ হাঁটা হাজার বছর ধরে — তাঁর এ ইতিহাস চেতনার দিকে একটু আলোকপাত করুন — 'ইতিহাসবিদ তার বক্তব্য শেষ করে পাল্টা প্রশ্ন করবেন লোক সংস্কৃতি গবেষককে : 'জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনার সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশে রয়েছে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি — কীর্তন ভাসান কথকতা — যাত্রা পাঁচালী-পুরাণকথা, রয়েছে কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা, রামপ্রসাদের শ্যামা, উমার প্রেমের গল্প, রয়েছে চণ্ডিমঙ্গল, আর মুকুন্দরাম কবি—
	• এ কথার 'কিউ' ধরেই গবেষক তাঁর বক্তব্য রাখবেন
• পর্দায় ভেসে উঠবে নক্সা পেড়ে শাড়ি, শঙ্খমালা কাঁথা, কল্কা পেড়ে / আনারসি শাড়ির আঁচল,	• তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে

VIDEO	AUDIO
শঙ্খের কৌটা, পানের বাটা, সোনার দীপ	
• ক্যামেরার সামনে আবার দুজন বক্তা — কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। • বক্তারা dissolved • পর্দায় দেখা যায় শ্মশান চিতা রঙীন নকশী কাঁথা/কন্থা পেড়ে শাড়ি আগুনে পুড়ছে	• ইতিহাসবিদের কথায় রূপসী বাংলাটির ক্ষয়ে যাওয়ার, ফুরিয়ে যাওয়ার, হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি এসে যায় — Music: নৈঃশব্দ্যের একটি এফেক্ট এনে তাকে খানখান্ করে ভেঙ্গে দেবে এক ধরনের Funeral choral গুঞ্জন। O/V ... যেইখানে কন্থাপেড়ে শাড়ি প'রে কোন এক সুন্দরীর শব চন্দন চিতায় চড়ে— Female voice: 'বাংলার লক্ষ লক্ষ গ্রাম নিরাশার আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেজ' ...। O/V Male voice: পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ...'
• 'রূপসী বাংলা' বইটির প্রচ্ছদ সমস্ত পর্দা জুড়ে দেখা যাবে — Bright হয়ে আবার ঝাপসা হবে — এর উপর ফুটে ওটা বাংলার মানচিত্র এবং মানচিত্রে আগুন • ন্যাড়া মাঠ, শস্যশূন্য, ফাটা জমি আর আকাশে শকুন উড়ছে	Female voice রূপসী বাংলা যেন যন্ত্রচালিত নাগরিক সভ্যতা চাপে পিষ্ট মানবাত্মা Male Voice Continues: ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু দেখেছি আমার হাতে হয়তো নিহত ভাইবোন, বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে— • মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে-সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে-আকাশে/শকুনেরা চরিতেছে ...
• পর্দায় জীবনানন্দের ছবি	• অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ ভোরের রাতে — নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত — Grim Funeral choral sound Fades out O/V

VIDEO	AUDIO
	• পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিয়ে যাব বয়ে —
• সত্যজিৎ রায়ের আঁকা 'রূপসী বাংলার' প্রচ্ছদ পর্দা জুড়ে আসবে — এর পর, পুর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা 'রূপসী বাংলা' : প্রকাশিত — অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর' বইটির প্রচ্ছদ	Grim music continues Female Voice (o/v) : 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব —' Fade out
• caption-কবিকন্যা মঞ্জুশ্রী দাশ	• বাঁশির একটুকরো সুর • 'কোথায় গেল সেই সবুজে পাতার ঝরে পড়া আর শালিখের পালকের খয়েরি আমেজ'।
• অনেক দুর থেকে বাংলার প্রকৃতি — নদী নালা সবুজ মাঠ; ধীরে ধীরে close হয় দৃশ্যগুলো এবং	• করুণ সুর বাঁশির, বাংলাদেশের ঢোলের একটা মৃদু আওয়াজ, তারপর আবার করুণ বাঁশি
• পর্দায় ভেসে ওঠে 'রূপসী বাংলার' ৬৫ নং কবিতার পাণ্ডুলিপি (রূ. বা., সম্পা, দেবেশ প্রতিক্ষণ ১৯৮৪) • caption - আবৃত্তিকারের নাম (আবৃত্তিকারকে দেখানো হবে না)	E.P. Record, HMV-7EPE-3098, 1975, Side 2/II বাজবে (দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে) কবিতাটির নির্বাচিত অংশঃ কোনদিন দেখিব না তারে আমি ... ... তবু আমি সাপচরা অন্ধপথে — বেণুবনে তাহার সন্ধান পাব নাকো ... প্রতিটি নক্ষত্র তার স্থান খুঁজে জেগে রবে তুচ্ছ অনুকণাটির পাশে/অন্ধকারে; তুমি, সখি, চ'লে গেলে দূরে তবু; হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে অশ্বত্থের শাখা ঐ দুলিতেছে :
• অশ্বত্থের শাখা দুলছে, আলো আসছে, ভোর হয়ে আসছে —	আলো আসে, ভোর হয়ে আসে
এ বিষয়টি লিরিক্যাল ভাবে Picturisation করা হবে	TITLE MUSIC (আবার আসিব ফিরে)
পর্দায় TITLE CARD • কৃতজ্ঞতা • গবেষণা	

VIDEO	AUDIO
• ভাষ্য ও আবৃত্তি	
• ক্যামেরা	
• শব্দ ও ধ্বনি	
• সংগীত	
• সম্পাদনা	
• রচনা ও পরিচালনা	
• প্রযোজনা	**Title Music Fade Out**

শেষের পাতা

উপসংহারে এ-লেখকের শুধুমাত্র একটি কথা'ই বলার আছে; তা হ'ল এ-বই' এর প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি যুক্তি ও পরামর্শকে উল্লঙ্ঘন করেও একজন সফল লেখক হয়ে ওঠা খুবই সম্ভব।

শৃঙ্খলাবোধের যে কথা বইতে বার বার বলা হয়েছে, তা লঙ্ঘন করার অধিকার লেখকের, একমাত্র লেখকেরই আছে। এখানে পণ্ডিত আর অজ্ঞ, জ্ঞানী আর মুর্খ, তাত্ত্বিক আর ভাবুকের কোন ভেদাভেদ নেই। প্রত্যেক লেখকই নিজস্ব ধরনে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। লেখার টেবিল বসে গেলে 'আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির কোন ভেদ নেই'।

* * *

প্রুফ সংশোধনের নমুনা

নিবিড় পাঠ :

মণিপুরি ভাষার বিস্তৃতি কেবলমাত্র 'মণিপুর' নামে কথিত রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে আসামের বরাক উপত্যকা সহ অপরাপর মণিপুরি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের এ বিস্তার যে সৃজনশীলতার বিনাশ ঘটেছে ব্রজমোহন সিংহের এ গল্পটিতে এর পরিচয় নিহিত। এ গল্প যেন সমস্ত উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রান্তিকায়িত অন্তেবাসীর মর্মবেদনার প্রকাশ। অনূদিত হয়ে গল্পটি যে ভাষায় প্রকাশিত হবে এ ভাষা এবং ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে এতে কোন দ্বিমত নেই। বরাক নদীর মাঝি আর গঙ্গাবতী সুরমা কিংবা লুইতের মাঝির বুকের ভেতর সঞ্চিত বেদনা এক হয়ে যায় লেখকের নিপুণ তুলির টানে।

পাঠসূত্র :

৪.৩

আসামের অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী ডিমাসাদের লোক সাহিত্য ও লোক কথার ঐতিহ্য থাকলেও আধুনিক পর্বে ডিমাসা কাব্য, সাহিত্য এখনও আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে পরিচিতি লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথ কাজি নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান বাংলা থেকে ডিমাসা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে মাইবং এবং খাসপুর কেন্দ্রিক ডিমাসা রাজসভায় বাংলা কাব্য, সংগীত এবং বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটেছে মহারাজ সুরদর্প নারায়ন থেকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ডিমাসা ভাষার সেরকম বিকাশ আমরা দেখিনি, এবং যা হয়েছে অনুবাদের মাধ্যমে তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। মণিচরণ বর্মন, নিরুপমা কাশ্যপের, রবীন্দ্রবাহী থাউসেন, ঐতিহাসিক নলিনেন্দ্রকুমার বর্মন এদের ডিমাসা ভাষা সংস্কৃতি, ইতিহাস নিয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটলেও ডিমাসা সৃজনশীল সাহিত্য আমাদের কাছে এখনও অধরা রয়ে গেছে। তুষারকান্তি নাথ তন্ময় ভট্টাচার্য এবং জাহিদ আহমেদ তপাদারের প্রয়াসে ডিমাসা লোককথা ও সামাজিক ইতিহাস সংস্কার ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। বর্তমান পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত অলস জুমিয়া (জুমচাষী, Shifting cultivator) এবং তাঁর দুই পালিত প্রাণীর গল্প 'নামাই' এদিকে আর ও আত্মসৃষ্টি ছন্দের নিশ্চয়।

ডিমাসা ভাষায় 'নামাই' শব্দের অর্থ 'বন্ধু' কিংবা বন্ধুত্বের উষ্ণ আহ্বান সূচক সম্বোধনও হতে পারে।

নিবিড় পাঠ :

৪.৪

লোককথা, ইংরেজিতে যাকে বলে Folk tale এমন কোন লিখিত বয়ান নয় লোকমুখে, স্মৃতিবাহিত হয়ে (Oral tradition-এ) প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এর বিস্তার। পশু-পাখিদের নিয়ে সর্বত্রই বিশেষ জনপ্রিয়। ডিমাসা হাসাও থেকে সংগৃহীত রোগা কুকুর এবং নাদুসনুদুস শূকরছানার এ কাহিনীর সঙ্গে দেশবিদেশের অপরাপর ধাঁচে প্রচলিত কাহিনীর মিল ডিমাসা সংস্কৃতির একটি গৌরবজনক পরম্পরার সাক্ষ্য বহন করে। রূপকের মাধ্যমে কথিত এ গল্পে মনুষ্য জীবনের কথাই বলা হয়েছে। পশুরা এখানে উপলক্ষ মাত্র।

সহায়ক বই, পত্র-পত্রিকা

অরুণেশ ঘোষ, জীবনানন্দ, কলকাতা- ১৯৯৮

উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, গৌহাটি (পুনর্মুদ্রণ)- ১৯৭২

কপিশ কান্তি দে (সম্পা:), বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্প, করিমগঞ্জ- ১৯৯৪

জীবনানন্দ দাশ, শ্রেষ্ঠ কবিতা ('জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'), কলকাতা- ১৯৫৬; রূপসী বাংলা, কলকাতা-১৩৯০ বঙ্গাব্দ

জ্যোতিভূষণ চাকী, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, কলকাতা- ১৯৯৬

দেবেশ রায় (সম্পা:), রূপসী বাংলা : প্রকাশিত-অপ্রকাশিত : পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর, কলকাতা- ১৯৮৪

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রচনাবলী ('দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী'), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ১৯৬৪

ধীমান দাশগুপ্ত, চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ, কলকাতা- ১৯৮৩

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বাংলা : কী লিখবেন, কেন লিখবেন, কলকাতা- ১৯৯৩

পূর্ণেন্দু পত্রী, রূপসী বাংলার দুই কবি, কলকাতা- ১৯৯০

প্রবাল দাশগুপ্ত, কথার ক্রিয়াকর্ম, কলকাতা- ১৯৮৭

প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, (১ম খণ্ড), কলকাতা- ১৪০০ বঙ্গাব্দ

বিমল চৌধুরী (সম্পা:) কী লিখি, কেন লিখি, শিলচর- ১৯৯৪

বিজিত ঘোষ (সম্পা:), সত্যজিৎ প্রতিভা, কলকাতা- ১৯৯৩

বিষ্ণু দে, জনসাধারণের রুচি, কলকাতা- ১৯৭৫

বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা- ১৯৬৬

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব, কলকাতা- ১৯৮৭

মীণাক্ষী দত্ত (সম্পা:) কবিতা : বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, কলকাতা- ১৯৮৭

মৃণাল সেন, সিনেমা, আধুনিকতা, কলকাতা-১৯৯২

রজত রায় (সম্পা:), ঋত্বিক ও তাঁর ছবি, (১ম খণ্ড), কলকাতা-১৯৭১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, কলকাতা- ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

গীতবিতান (অখণ্ড) কলকাতা- ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

শঙ্খ ঘোষ, উর্বশীর হাসি, কলকাতা- ১৯৮১

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, এই পথে অন্তরা, কলকাতা- ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ,

সমীর সেনগুপ্ত,

সমীর বসু (সম্পা:), বাংলা বানান : বিতর্ক ও সমাধান, কলকাতা- ১৯৯৭

সুজিৎ চৌধুরী, বরাক উপত্যকা প্রসঙ্গে: সত্য ও তথ্য, করিমগঞ্জ- ১৯৮৮;
প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য: কিংবদন্তীর পুনর্বিচার,
কলকাতা– ১৯৯০

সুভাষ ভট্টাচার্য, বাংলা: লেখক ও সম্পাদকের অভিধান,
কলকাতা-১৯৯৪

সুভাষ চৌধুরী,
সুচিত্রা মিত্র (সম্পা:) রবীন্দ্রসংগীতায়ন (১ম খণ্ড), কলকাতা- ১৯৮২

সত্যজিৎ রায়, বিষয় চলচ্চিত্র, কলকাতা- ১৯৮৯

Cuddon, J.A., A Dictionary of Literary Terms, Penguin books. 1982

Dunbar, Janet, Script Writing For Television, London- 1965

Eliot, T.S., The Sacred Wood, Indian edition, New Delhi- 1976

Gordon, Well, The Carft of Writing Articles, New Delhi 1983

Sabel, Ziegle (ed.,) Creative Writers' Handbook: What to Write, to Write it, Where to sell it, Everyday Handbook Series, n.d.,

Jones, E.D. (ed.,) English Critical, Essays: Nineteenth Century, O. U. P., 1971

Kaul, S.K.(ed.,) A Handbook for Writing Articles, New Delhi- 1983

Layman, Edna, What to Tell and How to Tell, 1971

Mehta, Nandini (ed..) Not a Nice Man to Know: The Bad of Khuswant Singh, Penguin books, 1993.

Maybury, Barry, Writers' Workshop: Techniques in Creative Writing, Batsford, 1979

Russell, Bertrand, The Wisdom of the West, London

Shakespeare, William, Antony and Cleopatra, MacMillan, London, 1962

Tully, Mark, No Full stops in India, Penguin Books, 1992

Walker, Lyn., Vision and Revision: A Guide for Creative Writers, London, 1981

Walford, A. J., Review and Reviewing, London, 1986

- Pelican Guide to English Literature.
- Modules of India Gandhi National Open University, CRWE, New Delhi.

'অনুষ্টুপ', পূজা সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৭

'অমৃতলোক' (জীবনানন্দ দাশ বিশেষ সংখ্যা), নং ৮২, কলকাতা, ১৯৯৮

'কলকাতা',	২য় বর্ষ (৩-৪ সংখ্যা), ১৯৭০
'গবেষণা পরিষদ পত্রিকা'	প্রথম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর, ১৯৯৫
'চিত্রবীক্ষণ'	কলকাতা (একাধিক সংখ্যা)
'সাহিত্য',	হাইলাকান্দি, আসাম (একাধিক সংখ্যা)
'দেশ'	কলকাতা (একাধিক সংখ্যা)
'বাংলা একাডেমী পত্রিকা',	৩৮তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, ঢাকা, বাংলাদেশ
'Critical Quaterly',	London (একাধিক সংখ্যা)
'India Today'	Sept, 15, 1988, New Delhi
'London Calling',	BBC World Service, London, Vol: 17, No.6; Vol: 18, No, 1234.
'NEIHA Proceedings',	Vol. 16, Sillong 1996
'The Statesman'	Calcutta (একাধিক সংখ্যা)
'The Telegraph',	Calcutta (একাধিক সংখ্যা)

নির্ঘন্ট

অক্ষর ৩০, ৭৭
অধিতব্য ৪১
অনুকরণ ২৭, ৪১
অনুপুঙ্খ-বিশ্লেষণ- ৫৬
অনুপ্রেরণা ২১, ২৩, ৪৪
অনুভূতি ১৩, ১৫, ২৪
অনুশীলন ১৩, ১৯, ২০, ২৪
অপেন এণ্ডিং ৫৯
অবিচ্যুয়ারি ৭১
অভিজ্ঞতা ১৮, ২১, ২৩, ২৪, ২৬
অভিধান ২৯, ৩৩, ৩৬
অলঙ্কার ২৭, ৫৪
অসমিয়া ৬২, ৬৩, ৬৪
আসাম ৮১

অ্যাকাডেমিক ২৯, ৩৭, ৩৮, ৩৯
অ্যান্টনি ৮৬
আকাদেমি ৩৭
আকাশবাণী ৫৭, ৭৮, ৮২, ৮৭, ৮৮
আঙ্গিক ২৬
আঙ্গিক সচেতনতা ১৫
আধুনিক ৯৯
আনন্দবাজার ৩৪, ৫৫
আবহসংগীত ৮৪
আবেগ ১৮, ২৪, ৫৮
আব্বাজানের হাড় ২২
আব্বাস, এ. কে ৯৬
আমি ৮১
আল বেরুণি ২১
আলি, মুজফ্‌ফর ৯৬
আলি, সৈয়দ মুজতবা ১৬
আশ্রফ আলী ২২

ইন্ডিয়া টু'ডে ৫৫, ৬৪
ইতিহাস, ঐতিহাসিক ১৬, ৪৬, ৪৮
ইতিহাস গবেষক ১৬
ইদ্রিস মিঞা ২২
ইনার আই ৯৫ ৯৬
ই.পি.ডবলিউ ৫৫
ইলেকট্রনিক মিডিয়া ৬৯

উচ্চারণ ৩৩
উচ্ছ্বাস ২৪
উত্তরাধুনিক ৪৩
উদ্ধৃতি ৩২, ৪৫, ৪৬, ৪৭
উপকল্প ৪২
উপগ্রহ সংস্কৃতি ৭৫
উপভাষা ৬২, ৮৮
উপন্যাস ১৬, ১৭, ২৮, ৯০, ৯৩, ৯৪
উপসংহার ১২০
উর্বশীর হাসি ৪০, ৫৯

ঊর্ধকমা ৩১

এ আমির আবরণ ৪০
একটি নক্ষত্র ৪০
একাডেমী ৪০
এ টেল অব টু ১৭
এডিট পেজ ৫৪
এন্টি হিরো প্লট ১৮
এমারি ৪৫
এলিঅট. টি. এস. ১৮, ২০

ওয়াইল্ড, অস্কার ৮৭
ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৮, ৫৫, ৯৯

ঔপন্যাসিক ১৭

কংগ্রিভ ৫৬
কথাচিত্র ৯৯
কথাসাহিত্য ২০, ২৩
কথিকা ৭৮
কবি ১৩, ১৪
কবিতা ১৫, ১৮, ২১, ৫৬, ৬১, ৬৩, ৭১, ৭৫, ৯৯
কমেডি অব ম্যানার্স ৫৬
কলম ৭৭
কল্পনা ১৭, ২২, ৫৮
কল্প-বিজ্ঞান ৮৭
কাছাড়ি ৬৩
কাছাড়ের ইতিবৃত্ত ৪৮
কাব্য ১৪
কাব্যতত্ত্ব ৫৪
কার্লাইল ১৭
কিতাব-উল্-হিন্দ ১৭
কিটস্ ১৯, ৫৫
কেতাবি ভাষা ২২, ৩৫, ৭৮
কোলরিজ ৫৬
ক্যামেরা ৭৭, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪
ক্রিটিক ৫৫
ক্রিয়াপদ ৬৪
ক্রিয়েটিভ রাইটিং ১৫, ২০
ক্রোড়পত্র ৫২
ক্লিশে ৩২, ৫৪
ক্ষেত্রানুসন্ধান ৩৯

খ্যাতি ১৪

গণমাধ্যম ৭৪
গদ্যলেখক ২৬
গবেষণা-নিবন্ধ ৪০, ৪৫, ৮২, ৯৬
গল্প বই ২৯
গান্ধী, মহাত্মা ৪৯
গীতবিতান ৩৪
গীতাঞ্জলি ২৭
গিবন ১৭
গুরুচণ্ডালী ৩৪
গুহ, উপেন্দ্রচন্দ্র ৪৮
গ্রন্থ-সমালোচনা ৫৭, ৫৯
গ্রিয়ার্সন, জন ৯৫
গ্রিন, গ্রাহাম ৩২

ঘটক, ঋত্বিক ৯৫, ১০০
ঘোষ, গৌতম ৯৫
——, শঙ্খ ৩০, ৬১

চক্রবর্তী, শ্যামলেন্দু ২২
——, শ্বেতা ৭৬
চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিমাধব ৩৪
——, শরৎচন্দ্র ১৮, ২৬
——, সুনীতিকুমার ১৭
চয়নিকা ৬১
চলতি ভাষা ৩৪
চলচ্চিত্র সমালোচনা ৫৩
চসার ৩২
চারুকলা প্রতিবেদন ৫৪
চারুলতা ৫৩
চিত্রকর ১৪, ২০
চৌধুরী, দেবব্রত ২২
——, নীরদচন্দ্র ৩৮
——, প্রমথচন্দ্র ৩২
——, বদরুজ্জামান ২২
——, সুজিৎ ৩৪, ৪২, ৪৪, ৬২, ৬৩

ছন্দ ১৯
ছন্দের বারান্দা ৪০
ছাপাখানার ভূত ৩২
ছোটগল্পের প্লট ২৬, ৮৭
ছোটলোক ২২

জনসন, ডক্টর ৫৬
জাগরণ ২২

জাতীয় কার্যক্রম ৯৬
জীবিত ভাষা ৩৪
জৈন, মধু ৬৫

টলস্টয় ৮৭
টাইটেল মিউজিক ৮৩
টাইমস্ লিটারেরি ৫৫
টার্গেট রিডার ৪৫
টিভি ৯০
টিভি ফিল্ম ৯৪
টেকনিক্ ২৩, ২৭

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১৪, ১৬, ১৯, ২২, ৩৩, ৩৪, ৪১, ৪৯, ৫০, ৫৯, ৬০,৯৫, ৯৯

ডকু ফিকশন ৪৫
ডকুমেন্টারি ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯
ডস্তয়েভস্কি ৮৭
ডাইসন, কেতকী ৪৪
ডায়লেক্ট ২২
ডিকেন্স ১৭, ৮৭
ডিডি-১ ৯৯
ডিমাসা ৬৩
ডিসকভারি ১৭

তত্ত্বগত ভ্রান্তি ৫৬
তথ্যচিত্র ৯৫
তথ্যসূত্র ৪২, ৪৯
তাত্ত্বিক ৩৮, ৪৩
তাভেরনিয়ার ১৭

থিসিস ১৭, ৩৯, ৪২

দত্ত, মীনাক্ষী ৬১
দর্শক ৯০, ৯৭
দাশ, জীবনানন্দ ১৫, ২১, ৫৬, ১০১
_____, শুক্লা ৯৬
_____, সজনীকান্ত ৫৬
দাশগুপ্ত, দেবাশিস ৬৮
_____, ধীমান ৯৩
_____, প্রবাল ৪২
দূরদর্শন ৩২, ৫৭, ৯৬
দৃশ্য ১৮
দে, বিষ্ণু ২০
_____, মলয়কান্তি ২২
দেখা ৩০, ৩১
দেশ ৫৭, ৬৮
দৈনিকপত্রিকা ৩২

নন-ফিকশান ২৯
নবীন লেখক ৩৯
নাটক ২২, ৮৫
নাট্যকার ১৯
নাসরিন, তসলিমা ১৫
নিউজ ম্যাগাজিন ৫৫, ৬৪, ৬৫
নিউজস্টোরি ৬৮
নিবন্ধ ২৩
নির্মাণ ২৭
নিহালনী, গোবিন্দ ৯৫
নীটশে ৫৬
নেসা, জেবউন ৪০
নেহেরু ১৭, ৩৮
নৈঃশব্দ্য ৮৬

পড়াশোনা ২৪, ২৭
পত্রী, পূর্ণেন্দু ৯৫
পথের পাঁচালী ১৮
পদ্ধতি ৩৯, ৪৩
পপুলিস্ট ৪৪, ৪৫
পরাঞ্জপে, সাঁই ৯৬
পরিকল্পনা ২৮
পরিচিতি ৩১
পরিমিতি ২৪, ২৬, ৬১
পরিসর ২৬
পশ্চিমবঙ্গ ৫৫, ৬৩

পাঠক ১৪, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৮
পাঠক্রম ২০, ৩১
পাঠ্যবই ১৯
পাণ্ডিত্য ২১, ২৮, ৫৫
পিএইচ.ডি (Ph.D) ৩৯
পিল্লাই, শিবশঙ্কর ৮৯
পুনর্নির্মাণ ১৮
পৃষ্ঠা ৩০
প্রকাশ ১৩, ১৪
প্রচ্ছদ ৩০
প্রজেক্টওয়ার্ক (Project Work) ৩৯
প্রডাক্‌শন ৯১
প্রতিপাদ্য ৪২
প্রতিশব্দ ২৯
প্রবন্ধ ১৭, ২৩
প্রব্রজন থিম ৬৭
প্রশিক্ষণ ২০
প্রস্তরলিপি ৪৮
প্রাইভেট চ্যানেল ৯৫
প্রাচীন ভারতে মাতৃ ৪২
প্রিন্ট মিডিয়া ৫২, ৫৩, ৬৫
প্রুফরিডার ৩২
প্রেরণা ১৫
প্রেস-কপি ৩২
প্লেটো ৩৭
প্ল্যাথ, সিলভিয়া ২০

ফকির, লালন ২০
ফর্ম ২৮
ফিচার ৪৪, ৮২
ফুলজানবিবি ২২
ফ্লাহার্টি ৯৫
ফ্যান্টাসি ৮৭

বটতলা ১৬
বড়গল্প ২৬
বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ২২
বরাক উপত্যকা ২২, ৩৩, ৩৫, ৪৮, ৬২, ৬৪
বসু, অম্বুজ ৪০
জয়ন্তী ৪৩
বুদ্ধদেব ১৮, ২০, ৬১, ৯৯
বাংলা ৩২, ৬২, ৬৩, ৬৪
বাংলা আকাদেমি ৩৭
বাক্-সংযম ৬১
বাংলাভাষা ৩২, ৩৪, ৩৮, ৬৩, ৬৪
বাঙালি ৬১, ৬৩
বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা ৪৫
বানান ৩২, ৩৩
বায়োফিল্ম ৯৬
বাল্মীকি ২০
বাশার, আবুল ২৭
বিদ্যাসাগর ৩২
বিবিসি ৫৭, ৮৭
বিষয়বস্তু ২৪
বিষয়ভিত্তিক ২৩
বুক্-রিভিউ ৫৭, ৫৮, ৬৫
বুদ্ধিজীবী ২৮
বৈদ্যুতিন মাধ্যম ৭০, ৭৪
ব্যঞ্জনা ১৫
ব্যবহারিক রচনা ১৫
ব্যাকরণ ২৯
ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ ২৭, ৭১
ব্রাউনিঙ ৮৭

ভট্টশালী, নলিনীকান্ত ৪৬
ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ৩৪, ৪০, ৫১
_____, জয়ন্তভূষণ ৫০
_____, তপোধীর ২৭, ৫০, ৬৩
_____, ভুবনেশ্বর বাচস্পতি ৬৩, ৬৪
ভাবাবেগ ৯৯
ভাবুক ১২০
'ভারতভ্রমণ' ১৭
'ভারতসংস্কৃতি' ১৭

ভাষা ১৭, ৩৪
ভাষাতত্ত্ব ৩৩, ৬২, ৬৩
ভাষান্তর ৬৬
ভিসুয়েল ৯৬
ভৌমিক, চিত্রভানু ২২, ৮৮
ভ্রান্তিসংশোধন ৪৭

মঞ্চনাটক ৮৬
মননশীল ১৭
মনিটর ৯১
মলাট লিখন ৩১, ৫৭
মল্লিক, সাধন ৯৬
মস্তিস্কচর্চা ৯৯
মহাফেজখানা ২৩
মহাবিলাত ৬৭
মহাভারত ৬৭
মাইক্রোফোন ৮৫, ৮৮
মাতৃভাষা, ৩৪, ৬৩
মাথুর ৯৬
মাধ্যম ১৪
'মানুষ মানুষের জন্য' ২২
মার্কসীয় ৪৩
মিউজিয়াম ২৩
মিল্টন ১৫
মিত্র, রাজ্যেশ্বর ৬৮
মিশ্র আঙ্গিক ৪৪
মিশ্র, সুবিমল ২৭
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ৫৯, ৬০
_____, বিনোদবিহারী ৯৫, ৯৬
_____, হৃষিকেশ ৯৬

রক্ষিত, বীরেন্দ্রনাথ ১৫
রচনাশিক্ষা ২০
রবীন্দ্ররচনাবলী ৩৩
রবীন্দ্রসংগীত ৬৮, ৭০
রাজন ৯৬
রাজা, রামমোহন ৩২
রাজা, হাসন ২০
রায়, ডি. এল. ৫৬
_____, নীহারঞ্জন ৪৬
_____, সত্যজিৎ ২২, ৮৭, ৯৩
_____, সৌগত ৪৫
রাসেল, বার্ট্রাণ্ড ১৫, ৩৮
রিভিউ এডিটর (Review editor) ৫৮
রিসার্চ জার্নাল ৩৯, ৪০
রেকর্ডিং ৮৮, ৮৯
রেডিও জেনিক ৮৯
রেডিও-টিভি ৬৯, ৭৪, ৭৫
রেডিও-ম্যাগাজিন ৮১
রুচি ৯৭
রুশদি ৬৪, ৬৬
রোমক সাম্রাজ্য ১৭
রোমান্টিসিজম ১৮

লরেন্স, ডেভিড হার্বার্ট ৮৭
লাইব্রেরি ২৩, ৩৪, ৪০, ৯৮
লিখনকর্ম ৫২
লিখন পদ্ধতি ৯১
লিখিত সাহিত্য ২৩
লিট্‌ল ম্যাগাজিন ৩০, ৩৮
লিরিক ৬৪
লেখক ১৯, ২৭, ২৯
লেখা ১৪, ১৯
লেনিন ৭২
লোকসংগীত ১৮
ল্যাম্ব, চার্লস ২৩

শব্দ ৮৩, ৯৩
শব্দকোষ ৩৩
শয়তানী ৬৬
শর্মা, শিব ৯৬
শিরোনাম ৩০, ৪০
শিল্পী ১৯, ৬৮
শিল্পচেতনা ২১

শিল্পসাহিত্য ২৩
শুটিং ৯৯
শেক্সপিয়ার ১৯, ৮৬
শেষের পাতা ১২০
শেষ প্রশ্ন ১৮
শৃঙ্খলা ৩৮, ১২০
শ, বার্নাড ১৪, ১৯
শ্রবণ ইন্দ্রিয় ৯০
শ্রীনারদি রসামৃত ৬৩
শ্রীহট্ট ৬৩

সংলাপ ৮৫, ৮৬
সকলেই কবি ১৩, ১৯
সক্রেটিস ১৫, ৩৭
সংগীত ১৪
সংগীত সমালোচনা ৫৪, ৬৮
সচেতন প্রয়াস ১৪
সঞ্চয়িতা ৬১
সময় ২৮
সমাজপতি, সুরেশ ৫৬
সমারূঢ় ৫৬
সমালোচক ২০, ২৯
সমালোচনা লিখন ৫২, ৫৩
সমালোচনা সাহিত্য ৫২
সম্পাদক, সম্পাদকীয় ২০, ৩০, ৩৪, ৫৮, ৫৯, ৬১
সরকার, পবিত্র ৩২, ৫০
সাকসেনা ৯৬
সাধুভাষা ৩৪
সাবঅল্টার্ন ৪৩
সাহিত্য অকাদেমি ৩৭
সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ৬৫
সিনেমা ১৬, ৯৪
সিরিয়াস ৪৫, ৬৫, ৮০, ৯৭
সিরিয়েল ৯৫
সিলেটি ৬৩
সূচিপত্র ২৭
সৃজনপ্রতিভা ২২
সৃজনশীলতা ১৩, ১৫, ১৯, ৬৪, ৭৫, ৮২
সৃষ্টি ১৯
সেন, প্রবোধচন্দ্র ৬১
মৃণাল ৯৫
শোভা ৯৬
সেপ্টোপাস ৮৭
সেমিনার ৩৯, ৪০
সোনারতরী ৫৬
সৌন্দর্যবোধ ২১
স্টাইল ২৭
স্ক্রিপ্ট ৭৪
স্টেটসম্যান ৫৫, ৬৫

হরিপদ কেরানি ১২০
হাজারিকা, সঞ্জয় ৪৫
হেমিংওয়ে ৮৭

লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, প্রাবন্ধিক। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, অন-লাইন ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অ্যাকাডেমিক্‌সের জার্নালে, সংকলনগ্রন্থে ইংরেজি ও বাংলায় অসংখ্য গবেষণা-নিবন্ধ লিখেছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনেক প্রকল্পে গবেষক এবং উপস্থাপক হিসেবেও কাজ করেছেন। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের 'আকাদেমি পত্রিকা'র একাধিক সংখ্যার সম্পাদক। প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে 'আজকের শ্রোতার বাংলা গান' (২০০৫), 'বরাক উপত্যকার ইতিহাস ও সমাজ' (২০১১), উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ রচিত 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' (সম্পাদিত গ্রন্থ, অমলেন্দু ভট্টাচার্যের সঙ্গে), 'Portends of Disaster: Challenges before the Linguistic Minorities in Assam' (২০১১) 'শিক্ষাজগতের আলো আঁধার : এক ভিলেজ স্কুল মাস্টার এর স্বীকারোক্তি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (২০১৬), 'Information on Barak Valley. (Govt. of Assam. (২০১৭)। তাছাড়াও শিলচর জেলা সদর প্রশাসনের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত Coffee Table Book, Sesquicentennial Souvenir-এর সম্পাদনা ছাড়াও অনেক শিক্ষামূলক প্রকল্প এবং বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের 'ভাষা আকাদেমি'র সঙ্গেও তিনি জড়িত।

...লিখতে বসে বার বার অভিধান ঘাঁটা 'কী যে মিহি কেরাণীর কাজ' তা লেখক মাত্রেই জানেন। এ শ্রম দূর করার একটি আনন্দময় পন্থা লেখকদের দেখিয়ে দিই। মনে করুন লিখতে বসে সমস্যা হ'ল 'নিবিড়' না 'নীবীড়' লিখব, 'নিশীথিনী' না 'নিশিথীনি', 'নীরবে' না 'নিরবে', 'ভৎসনা' না 'ভর্ৎসনা', 'উষা' না 'ঊষা', 'মন্দাকিনী' না 'মন্দাকীনি'?

বহুশ্রুত গানের কলিগুলো মনে মনে ভাঁজতে ভাঁজতে কিংবা মৃদুস্বরে গাইতে গাইতেই ওল্টাতে থাকুন 'গীতবিতান'-এর পাতাগুলো— 'নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী-সম, তুমি রবে নীরবে' (পৃঃ ২৯৭),

'...তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে-সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই' (পৃঃ ১৫), 'মন্দাকিনীর ধারা, ঊষার শুকতারা' (পৃঃ ১)— সুরের গুরু এসে ঠিক দিয়ে যাবেন দীক্ষা। ক্লান্তি দূর হবে, সঠিক বানানটিও এস যাবে কলমের ডগায়। লেখার টেবিলে একটি অখন্ড 'গীতবিতান' রেখে দিন। দেখবেন অভিধানের বিকল্প হিসেবে এ বইটিও ব্যবহার করা যায়।...